অন্ধকার গভীর গভীরতর

সমরেশ বসু



প্রথম প্রকাশ :

—বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯ ১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৯

মুদ্রাকর

শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী

সরস্বতী প্রেস

১২, পটুয়াটোলা লেন,

কলকাতা-৯

শ্রীপ্রভাস কুমার চৌধুরি

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

অপরিচিত

অলিন্দ

অগ্নিবিন্দু

অচিনপুর

অলকা সংবাদ

বিষের স্বাদ

রূপায়ন

১

মানুষের জীবন একদিকে যেমন বিস্ময়কর, আর একদিকে তেমনিই অপ্রাকৃত। কথাগুলো বিশ্বাস করবার হেতু ঘটেছে, আমার নিজের জীবনের কিছু ঘটনায়। আমি জ্ঞানত সেরকম কোনো পাপ না করেও, পাপবোধের দ্বারা আক্রান্ত, অথচ তার কোনো কারণ থাকা উচিত না। প্রায় অন্যমনস্ক অবস্থায়, আমি যেন শিউরে শিউরে উঠি, মনে হয়, একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে আমি মরে যাচ্ছি।

কিন্তু এসব কথা বলার আগে, প্রস্তাবনা স্বরূপ, আমার নিজের পরিচয়টা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি, এবং সেই সঙ্গে, আমার নিজেকে যতোটুকু জানা আছে, আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আচার-আচরণ ভালো-মন্দ লাগাগুলো বলে নিতে চাই। আমি একটি ব্যাংকের হেড অফিসের ম্যানেজার। চাকরির দিক থেকে খুবই লোভনীয় চাকরি আমার। তিন হাজার টাকা বেতন পাই। কলকাতায় পৈতৃক বাড়িতে বাস করি, এবং সেটা দক্ষিণ ঘেঁষে, মধ্য কলকাতার মতো জায়গায়। আমার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান বর্তমান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। আমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

পারিবারিক এবং সাংসারিক ও সামাজিক জীবনধারণের ক্ষেত্রে, যেগুলো থাকলে, মানুষ নিজেকে মোটামুটি সচ্ছল ও সুখী মনে করতে পারে, আমার প্রায় তার সবই আছে। বাড়ি গাড়ি টেলিফোন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে কোনো কথাই উঠতে পারে না। আমার স্ত্রীর বয়স তেত্রিশ। তেমন একটা রূপসী না হলেও, মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। এখনো স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। দাম্পত্য জীবনের দিক থেকে খুব একটা অসুখী বলা যায় না, তবে কিছুটা ঈর্ষায় সব সময়েই প্রায় ভোগে, এবং তার হেতু আমিই। ওর প্রতি আমি নিরাসক্ত না, কিন্তু যাকে বলা যায় ফেইথফুল হাজব্যাণ্ড, আমাকে ঠিক তা বলা যাবে না। যদিচ আমার স্ত্রী কখনো আমাকে অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখে নি, তথাপি, আমি জানি, নানা লোকে নানা কথা ওর কাছে বলে। যারা বলে, তারা হয় তো তিলকে তাল করতে ভালবাসে, কিন্তু তিল পরিমাণ ব্যাপারটার মধ্যে সত্যতা আছে।

তাছাড়া, লোকের কথা বাদ দিলে, আমার স্ত্রী নিশ্চয় আমাকে কিছুটা বুঝতে পারে। এবং সে আমাকে অনুযোগ করতে ছাড়ে না যে, আমি পুরোপুরি বিশ্বাসী স্বামী না। দু'একজন মহিলার বিষয়ে ও জানে, আমি তাদের একটু অনুরক্ত, মেলামেশাও করি। যা ও খুব সুনজরে দেখে না।

কিন্তু এসব কথায় পরে আসছি। কেন না, আমার স্ত্রীর পার্সপেক্‌টে, আমাকে আমি উপস্থিত করতে চাই না। নিজের বিষয় নিজেই ব্যক্ত করবো। আমার ছেলের বয়স প্রায় বারো, কন্যার বয়স আট। এখনো তাদের নিয়ে, আমার দুশ্চিন্তার কিছু দেখা দেয় নি। ওরা দুজনেই আমাদের অত্যন্ত অনুরক্ত সন্তান, আমরাও ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী বাবা-মা।

এর পরে আমি আমার নিজের কথায় আসি। আমি আমার

চাকরির ক্ষেত্রে কখনোই প্রায় দায়িত্ববোধহীনতার পরিচয় দিই না। কাজে কেউ ফাঁকি দিলেও আমি বিরক্তবোধ করি। সেজন্য অফিসে আমি সকলের প্রিয় হতে পারি নি। আবার অনেকের প্রিয়ও আছি। আমার আচরণে মোটামুটি সকলেই, অন্তত সামনাসামনি খুশি। আমি মুখ গোমড়া করে একটা মুহূর্তও থাকতে পারি না। এমন কি কারোর কাজের গাফিলতির সময়েও, আমি মোটেই মেজাজ গরম করে, চড়া স্বরে কথা বলি না। আমি খুব দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ-ভাবে সমালোচনা করি। খুব বিক্ষুব্ধ হলে, খানিকটা অভিমানহত-ভাবে নীরব থাকি, অথবা বড়জোর বলি, ইম্‌পসিবল, আমি আর এভাবে চাকরি করতে পারছি না।

অর্থাৎ, আমি অপরের মনে অনুশোচনাবোধ জাগিয়ে তুলতে চাই, যাতে সে তার কাজ সম্পর্কে নিজেকে শুধরে নিতে পারে। যদিও বর্তমানকালটা আমার এইসব আচরণবিধির সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে চলতে চায় না, তথাপি স্বীকার করতেই হবে, আমি সার্থক। আমি ভারিক্কি গম্ভীর চালে, কখনো কথা বলি না। আমার বয়সের তুলনায়, আমি তরুণের মতো ব্যবহার করবার চেষ্টা করি। অবিশ্যি, হাসতে হাসতে বলতে পারি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, আমার চেহারাটি ভালোই, এবং গোপনে বলতে পারি, অনেকের হিংসার পাত্র। পোশাক-আশাকের দিকে আমার নজর খুবই সচেতন। নিজেকে, চুল থেকে পা পর্যন্ত সাজাতে ভালবাসি, এবং কী পোশাকে মানায়, আমি তা জানি। আসলে, বলা যেতে পারে, আমি সব সময়েই স্মার্ট থাকতে চেষ্টা করি। যে কারণে আমার বন্ধুরা বলে থাকে, আমাকে মোটেই একজন রেসপন্‌সিবল্ কর্মকর্তা বলে মনে হয় না। ডনজুয়ান ছোকরা বলে মনে হয়।

বন্ধুরা আমাকে কেউ কেউ লেডিকিলারও বলে। অফিসেও বলে। এবং আমি জানি, আমার অফিসের মেয়েকর্মীরা আমার

দিকে কী চোখে তাকায়। অবিশ্যি আমি সেখানে যথেষ্ট সাবধানে থাকি, এমন কি কোনো কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখতে ভালো লাগা সত্ত্বেও। এমনিতেই আমাকে নিয়ে নানারকম কথা হয়, আমি আর অফিসের লোকদের মুখর করতে চাই না, ঈর্ষাকাতরও না।

আমি সত্যিই একজন লেডিকিলার কিনা জানি না, তবে অনেকের প্রীতি এবং অনুরাগ আমার ভাগ্যে জুটেছে। আমি নিজেও মেয়েদের সম্পর্কে, বলতে গেলে, একটু বেশি মাত্রায় দুর্বল। অবসর এবং অবকাশের সময়ে, আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতেই ভালবাসি। যদিও তা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বরং অনেক সময় বান্ধবীদের বঞ্চিতই করতে হয় আমাকে। এবং তার জন্য মনে মনে অনুশোচনা হয়, এবং বিক্ষুব্ধ হলেও, কিছু করার থাকে না, কারণ কোনো অনিবার্য হেতু না থাকলে, বান্ধবীদের সান্নিধ্য আমি কখনোই ছাড়তে চাই না।

অতএব বলা যেতে পারে, মেয়েদের প্রতি আমার যথেষ্ট আসক্তি আছে, আর সেই সঙ্গেই আছে সুরার ওপর। সুরাপান করতে ভালবাসি বললে ভুল হবে, আমি রীতিমতো সুরাসক্ত। আর সুরাপান করে, রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকবার পাত্র আমি না। বোধহয় সুরাসক্ত ব্যক্তিরা কেউ তা নয়। একটু হাসি খুশি নাচ গান করতে গেলে খুবই খুশি। যে কারণে একলা একলা মদ্যপান, আমি চিন্তাই করতে পারি না, আর ভালো লাগে না, একান্তই পুরুষের আড্ডায় বসে, মদ্যপান আর মেয়েদের নিয়ে রসালো গল্প। ওটা আমার কাছে ভালগারিটি বলে মনে হয়। তার চেয়ে, মেয়েদের সঙ্গে বসে পান করা অনেক ভালো। সেখানে প্রেমালাপ না হোক, এমন কি রসালাপ না হয়ে যদি অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হয়, তাতে আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

এর পরে, বোধহয়, ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না, আমার

স্ত্রী কেন কিছুটা ঈর্ষায় ভোগেন। এ ক্ষেত্রে আমার অনেকবারই মনে হয়েছে, ঠিক একই ব্যাপার যদি আমার স্ত্রী করতেন, তা হলে আমি কি করতাম। জানি, আমার স্বীকারোক্তি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমার স্ত্রী যদি আনন্দ পান, অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশে, আমি আপত্তি করবো না। সত্যি বলতে কি, তিনি যদি কিছু করেনই, আমার আপত্তিতে কী যায় আসে? কেন না আমার মতো, তিনিও নিশ্চয়ই জানিয়ে কিছু করবেন না। তথাপি আমি বলবো, ওর যদি কারোকে ভালো লাগে, তা হলে ও তার সঙ্গে মিশতে পারে, অবিশ্যিই এর দায়-দায়িত্ব তার নিজেরই, ও কী ভাবে পরিবার ও সমাজে সেটাকে রূপদান করবে।

এর পরে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভালবাসা বলে ব্যাপারটা তা হলে শূন্য নাকি?

আমি খুবই বেকাদায় পড়ে যাই। সত্যি, এর সঠিক কোনো জবাব আমার জানা নেই। অথচ জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, আমি চোখের জল রোধ করতে পারি নি, বুক টনটন করেছে, ব্যথা বোধ করেছি। আর সেসব বিভিন্ন কারণে, তার সঙ্গে আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আমার স্ত্রীকে যখন আমি কখনো একলা বিষাদভরা মুখ নিয়ে বসে থাকতে দেখেছি, তখন আমার বুকে কেমন একটা কষ্ট বিঁধে যায়। সন্তান প্রসবের সময় গভীর উদ্বেগ বোধ করেছি, এবং দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিট এবং সুখ প্রশ্নের অতীত। কিন্তু ভালবাসা? আমি জানি না, সত্যি জানি না, লোকে যে এতো ভালবাসা বলে, তার সঠিক অর্থটা কী।

আমার নিজের এই মোটামুটি পরিচয়ের পরে, আমি যা বলতে চাইছিলাম, সে কথাই বলি। নিজের বিষয়ে যে সব কথা বললাম, সে সব বিষয়জাত কারণেই যে আমি পাপবোধে আক্রান্ত, এ কথা আমার কখনো মনে হয় না। আমি যেন এক অজ্ঞাত কারণে

পাপবোধে আক্রান্ত, যে পাপবোধে, মাঝে মাঝে আমি শিউরে উঠি। আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়, অনেকটা মূর্ছাগ্রস্তের মতো হয়ে পড়ি, এবং সেটা কখন কী ভাবে আসে, আমি আগে থেকে কিছুই জানতে পারি না। আমি জানি না, যারা এপিলেপ্‌সিতে ভোগে, তারা আগে থেকে, শরীরে মনে বা মস্তিষ্কে কিছু অনুভব করে কী না।

তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমার জীবনযাত্রার যে সব প্রণালীর কথা বললাম, তার সঙ্গে সেই অজ্ঞাত পাপবোধের কোনো যোগাযোগ আমি কখনো অনুভব করি নি।



'চা রাখলাম।'

ঘুমটা আমার পাতলা হয়েই এসেছিল। রাস্তার যানবাহনের শব্দ পাচ্ছিলাম। দূরের ট্রাম রাস্তার ট্রামের ঘর্ঘর বা ভারি মোটর-বাসের গর্জনও কানে আসছিল। পুত্র-কন্যার কণ্ঠস্বর একটু-আধটু শুনতে পাচ্ছিলাম। এখনকার অবস্থাটাকে ঘুম বলে না। জেগে ওঠবার আগে, একটা ঘোর মাত্র।

সকালবেলার প্রথম চা, শোবার ঘরে আমার স্ত্রী-ই দেয়। আমি জবাব দিলাম, 'হুম্‌!'

'বেশি দেরি করো না, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। পৌনে আটটা বেজেছে।'

একথাও ও রোজই বলে। যদিচ, আমি প্রায় কখনোই তারপরে আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকি না। কালে-ভদ্রে কখনো কখনো হয়ে

থাকতে পারে। এ কথা বলেই ও চলে যায়। আমি উঠে বসলাম। চৈত্র মাস। গরম মোটামুটি বেশ পড়েছে, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। তবে কলকাতার চৈত্র মাসের প্রকৃতি আমার বেশ ভালোই লাগে। কলকাতাকে যে যাই বলুক বা মনে করুক, আমি কিন্তু চৈত্র মাসে কলকাতায় মধুমাসেরই রস পাই।

আমি খাট থেকে নেমে, সামনের টেবিলের কাছে চেয়ারে বসলাম। ইংরেজি আর বাঙলা খবরের কাগজটা চোখের সামনেই। আমি সেদিকে চোখ রেখে, চায়ের কাপের হাতলে হাত দিয়ে কাপ তুলতে গিয়ে, বুড়ো আঙুলে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করলাম। চায়ের কাপটা তুলতে পারলাম না। আঙুলটা চোখের সামনে তুলে দেখলাম, একটু ফুলেছে, একটা নীলশিটা দাগও পড়েছে। কখন কী ভাবে লাগলো, কিছু মনে করতে পারছি না। বাঁ হাত দিয়ে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা হেলাতে গিয়ে দেখলাম, ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। এবং আঙুলটা বেশ গরম।

আমি বাঁ হাতে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিলাম, এবং অনেক ভাববার চেষ্টা করলাম, বুড়ো আঙুলটায়, কখন কিভাবে লাগলো। যেন মচকে গিয়েছে, বা কেউ জোর করে ধরে মটকে দিয়েছে, সেরকম একটা ভাব। কী হতে পারে, কিছুই বুঝতে পারছি না। আঙুলটা আমি গালে ঠেকালাম, বেশ গরম। ভয় লাগে, প্লেগ রোগ নাকি এ ভাবেই প্রথম দেখা দেয়। আঙুল ফুলে ওঠে, ব্যথা হয়, আর সেটা বুড়ো আঙুলই।

এমন সময় আমার স্ত্রী এলো। ওর নাম রমা। জিজ্ঞেস করলাম, 'রমা, গতকাল রাত্রে ফিরে, আমি কি তোমাকে আঙুলের ব্যথার কথা কিছু বলেছিলাম?'

রমা অবাক হয়ে বললো, 'না তো? কোন্ আঙুলে ব্যথা?'

আমি ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখালাম। ও স্পর্শ করে

বললো, 'এ তো বেশ লেগেছে দেখছি। কী করে লাগালে? কাল রাত্রে কিছু বলো নি তো?'

বললাম, 'জানিই না তো কিছু। এখন চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে ব্যথা টের পেলাম, তার পরে দেখছি, ফুলেছে!'

'নীল শিটা দাগও তো পড়েছে দেখছি। গাড়ির দরজায় চেপটে যায় নি তো?'

'মনে পড়ছে না তো?'

'কাল তো তুমি সেরকম একটা বেহুঁশ-ছিলে না? ড্রিংক খুব কম করো নি, তবে টালমাটাল অবস্থা ছিল না। কিন্তু—'

রমা চুপ করে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কী?'

রমা ঠোঁট টিপে হেসে, আমার খাটের দিকে সরে গিয়ে বললো, 'তোমার গা থেকে খুব ইনটিমেসির গন্ধ বেরোচ্ছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মেখে বেরোও নি তো, তাই বলছি।'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, এখন আর রমা হাসছে না, মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এসেছে। আমি মুখ ফিরিয়ে, চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। আমার চোখের সামনে রূপার মুখ ভেসে উঠলো। মনে পড়লো, গতকাল রাত্রে আমি রূপার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। রূপা অবিশ্যি আজকাল বম্বেতে থাকে। কয়েকদিন হল এসেছে। ও ডিভোর্সি ওয়াইফ। বম্বেতে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। এক ছেলে, বছর ছয়েক বয়েস, ও বম্বেতেই রূপার সঙ্গে থাকে। রূপাকে মাঝে মাঝে চাকরির ব্যাপারেই কলকাতায় আসতে হয়। পুরনো বান্ধবী। এলেই খবর দেয়। সুরাপ্রীতিটা ওরও আছে। ধূমপানও করে। বয়েস এখন বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। আমরা ভোলাপচুয়াস বলি, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী ধরনের মেয়ে। ড্রিংক করলে বেশ ওয়াইল্ড হয়ে ওঠে। রূপ আর স্বাস্থ্য, দুটোই এখনো বেশ বজায় রেখেছে। মনে পড়ে গেল, গতকাল রাত্রে ওর ওখানে গিয়েছিলাম। আমি হেসে রমাকে

বললাম, 'যেসব মেয়েরা সেন্ট ব্যবহার করে, তাদের সামনে গেলেই গায়ে গন্ধে এসে যায়।'

রমা বললো, 'অ্যাজ পার য়োর থিওরি। তুমি তো এখন সিগারেট খাবে। আমি একটু নুন গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, আঙুলটা একটু ডুবিয়ে রাখো। আরাম হবে।'

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম, কাল রাত্রি থেকেই ওর মন খারাপ হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, গতকাল রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়েছি কী না। মনে করতে পারছি না। তবে আমি গত রাত্রে তো নাকি বেশ সোবার ছিলাম। তা হলে নিশ্চয়ই বাড়িতে এসে খেয়েছি। না খেলে, রমা বোধহয় এখনই আমাকে কিছু বলতো। গতকাল রাত্রে রূপার ওখানে গেলাম, রূপা স্কচের বোতল বের করলো। ঝি এসে সোডার বোতল আর ওপ্‌নার এনে দিয়ে গেল। আমরা ড্রিঙ্ক করলাম। বোধহয় কিছু খাবারও ছিল।

আমার তেমন খেতে ইচ্ছে ছিল না। মনও ছিল না। দু-এক পেগের পরেই, রূপাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলাম, এটা মনে আছে। রূপাও তার প্রায় আগ্রাসী প্রতিদান দিল, তাও মনে করতে পারছি। তারপরে···তারপরে একেবারে ব্ল্যাকআউট। কিছুই মনে করতে পারছি না। জামাটামা খুলেছিলাম কিনা, কিছুই মনে নেই। বোধহয় জামা খুলেছিলাম। তা না হলে জামায় রূপার লিপস্টিকের দাগ লাগতো। এখন যেন আবছা মনে পড়ছে, রূপার সঙ্গে গতকাল কিছুই বোধহয় বাদ যায় নি। আবছা হলেও, ওর নিরাবরণ শরীরটার ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে, এবং সেই সঙ্গে ওর উজ্জ্বল আরণ্যক আচরণ। কিংবা ভুল ভাবছি, আর কিছুই মনে করতে পারছি না। কি ভাবে বিদায় নিয়েছি, গাড়িতে উঠেছি, বাড়ি এসেছি, খেয়েছি, এবং রমার সঙ্গেও আমার মিলন ঘটেছে কি না, কিছুই মনে করতে পারছি না। পায়জামাটা

যে কি ভাবে পরেছি, তাও মনে নেই। সম্ভবত রমাই পরিয়ে দিয়েছে, কারণ আমার সে অবস্থায় চাকর-বাকরেরা কেউ আমার সামনে বিশেষ আসে না। রমাই তাদের আসতে দেয় না। মোটামুটিভাবে, রাত্রে বাড়ি ফিরে আসার পরে, সমস্ত দায়িত্ব রমার।

আমি আঙুলটা তুলে আবার দেখলাম। না, কিছুই মনে করতে পারছি না। ফোলা নীল শিটা দাগ, ব্যথা, সব কিছু থেকে রমার কথাটাই সত্যি বলে মনে হয়, যেন গাড়ির দরজায় বা সেই রকম ভাবেই কোথাও বুড়ো আঙুলটা চেপ্‌টে গিয়েছিল। তখন খেয়াল থাকলে নিশ্চয়ই আমি আঙুলটা ঠাণ্ডা জলে ডোবাতাম, বা রূপার বাড়িতে কিছু ঘটলে, ওর ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে, আঙুলে ঘষতাম। কখন কি ভাবে, কি ঘটেছে, কিছুই মনে নেই। টোটাল ব্ল্যাকআউট, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমার মস্তিষ্কের কোষে। কিছুই মনে করতে পারছি না।

অফিসে কিছু হয়ে থাকলে মনে থাকতো। অফিসের প্রায় প্রত্যেকটি কথাই আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমানত বা পেমেণ্ট, ছুটির দরখাস্ত, ইউনিয়নের নোটিশ, অফিস ক্লাবের নাটক এবং বিশেষ বিশেষ যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সবকিছু, সকলের কথাই আমার মনে আছে। অফিসে সারাদিন বারে বারেই রূপার কথা মনে পড়েছে, তাও আমার মনে আছে। কাজ শেষ করে কখন রূপার কাছে যাবো, সেটা আমার মনে মনে বেশ ক্রিয়া করেছিল। সেখানে আমার আঙুলে কোনোরকম লাগলে, একটা রীতিমতো ব্যস্ততা লেগে যেতো। তা ছাড়া, সেখানে আঙুলে লাগবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

রূপা কি আমার এই বুড়ো আঙুলটা কামড়ে দিয়েছিল? একটু মেতে তেতে গেলে, রূপার দাঁত জিভ একটু বেশি কাজ করে। জিভ যে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, তা শুধু না। নানাভাবেই তা ক্রিয়াশীল।

এবং দাঁতও সেই রকম। কিন্তু আঙুলটা দেখে মনে হচ্ছে, এটা দংশনের আঘাত না। তা ছাড়া রূপা জানে, আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে, রমার সামনে এসে দাঁড়াতে হবে, ও কোনো দাগ রেখে দেবে না, যাতে আমি কোনো রকমে বিব্রত হতে পারি বা অস্বস্তিতে পড়তে পারি।

রমা—আমার স্ত্রী, ও অবিশ্যি আমাকে যখনই আদর করে চুমো খায়, তখনই একটু ঠাট্টা করে বলে, কতো চুমোর দাগ যে এ ঠোঁটে আছে, আমার আর ইচ্ছা করে না। যদিচ তথাপি খায়। রূপা, আমার এখন মনে পড়ছে, গতকাল একবার আমার ঠোঁটে দংশন করেছিল, তখন ও রীতিমতো তেতেই ছিল, আমিই আত্মরক্ষা করেছিলাম। অবিশ্যি আমি তখন ওকে রমার কথা বলি নি, তা হলে ওর জেদ বেড়ে যেতো, এবং একটা দাগ রেখে দেবার চেষ্টা করতো। এ সব বিষয়ে, মেয়েরা বোধহয় একটু প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়, অথবা ব্যাপারটা মোটেই তা না, নিতান্তই প্রকৃতিজাত—অর্থাৎ ইনস্টিংকট যাকে বলে।

চা শেষ করে, আমি সিগারেট ধরালাম। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে, অন্যমনস্কভাবে চোখ বোলাতে গেলাম, চাকর একটা চিনেমাটির পাত্রে নুন গরম জল নিয়ে এল। বললো, 'মা আপনাকে আঙুল ডোবাতে বললেন।'

বাটিটা রেখে ও চলে গেল। আমি আঙুলটা ডুবিয়েই তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম। জলটা এখনো বেশ গরম, ডুবিয়ে রাখা যায় না। পিছন থেকে রমার গলা শুনতে পেলাম, 'একটু কষ্ট করে আঙুলটা ডোবাও। অনেক গরম তো সহ্য করো, এটাও একটু করো।'

ও যে আবার কখন ঘরে ঢুকেছে, খেয়াল করি নি। হেসে বললাম, 'আমার মতো অফিসে কাজ করতে হলে, তোমাকেও গরম সহ্য করতে হতো।'

রমা বললো, 'আমি তোমার অফিসের গরমের কথা বলি নি।'

'তবে আবার গরম কী। আমি তো জানি, অফিসের সবাই গরম হয়ে আছে, আর সেই গরম আমাকে সহ্য করতে হয়।'

'তুমি ভালোই জানো, আমি কোন্ গরমের কথা বলছি। আঙুলটা ডোবাও।'

আমি মুখ ফিরিয়ে রমার দিকে দেখলাম। ও ওয়ারড্রব খুলে, আমার শার্ট আর টাই বের করে, মিলিয়ে দেখছে, ঠিক ম্যাচ করছে কী না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে না। আমি বুড়ো আঙুলটা আবার গরম জলে ডোবালাম, বললাম, 'তোমার গরমের কথা বলছো?'

রমার জবাব শোনা গেল, 'ভালোই জানো, আমার আর কোনো গরম নেই। তুমিই এখনো অগ্নিশ্বর।'

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'কথাটা কি ঠিক বললে রমু, তোমার আর কোনো উত্তাপ নেই? তোমার উত্তাপেই আমি অগ্নিশ্বর।'

[illegible] ...র ও ঠাট্টাটা করো না। কাল রাত্রে কোথায় কার কাছে গেছলে বলো তো?'

আমি বেশ সচেতনভাবেই, তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'ক্লাবে গেছলাম বলেই তো মনে পড়ছে যেন।'

'মনে নেই?'

'মনে আছে, ক্লাবেই গেছলাম।'

'কাদের সঙ্গে বসেছিলে?'

'সেটা ঠিক সব মনে নেই। কিছু ননবেঙ্গলী ফ্রেণ্ডস্ ছিল মনে হচ্ছে।'

'সকলেই লেডিজ, না জেণ্টলম্যানও ছিলেন?'

'কমবাইনড—বোধহয়।'

'বোধহয়?'

হেসে ফেললাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ এত জেরা করতে শুরু করলে কেন বলো তো ?'

রমা বললো, 'জানতে চাইছি, আঙুলটায় ওভাবে লাগলো কেমন করে। কারোর সঙ্গে মারামারি করতে হয় নি তো ?'

'মারামারি ?'

'অসম্ভব কি ? কারোকে নিয়ে হয়তো কমপিটিশন লেগে গেছলো।'

'তার মানে, প্রেমের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বলছো ?'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম। রমা বললো, 'প্রেম কি না জানি না, দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে পারে তো ?'

হেসেই বললাম, 'ওটা কোনোদিন করেছি বলে তো মনে করতে পারি না। আজকাল কি আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের যুগ আছে ?'

রমা বললো, 'আছে নিশ্চয়ই, ভিন্ন রূপে, সেটা তুমি ভালোই জানো। ছাখো, এই জামা আর টাই রাখলাম, পরবে ?'

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, র সিল্কের হাই কলার সোনালি শার্ট, কোর্স কাপড়ের হার্ড নাগা টাই।

বললাম, 'চমৎকার, এ টাইটা অনেক দিন পারি নি।'

টাইটার রঙ রাঢ় দেশের লাল মাটির মতো, গেরুয়া রঙ যাকে বলে, আর লাল তীরের ফলা, এমব্রয়ডারি করা। রমা বললো, 'কোন্‌টাই বা পরছো। আমি যা বেছে দিই, তাই তো পরো।'

বললাম, 'তোমার পছন্দই, আমার পছন্দ।'

রমা বললো, 'শুনতে খুবই ভালো লাগে। আঙুলটা কেউ কামড়ে দেয় নি তো, কোনো বান্ধবী ?'

রমা মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে নি। বললাম, 'সে রকম কোনো বাঘিনীর কথা তো মনে করতে পারছি না।'

রূপাকে নিয়ে প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছিল। রমা বললো, 'বাঘিনী কেন, মানবীরাও মাঝে মাঝে দাঁত বসাতে ভালবাসে।'

রমা দাঁত বসায়, তবে তেমন মারাত্মক কিছু না, অর্থাৎ রূপার মতো না। বা আমার আরো দু'একটি বান্ধবী যেমন আছে, দাঁত বসাতেই তাদের তুষ্টি। সেটা সাদিজম্ কিনা, জানি না। আঙুলটা গরম জলে ডুবিয়ে, এখন আরো বেশি লাল হয়ে উঠেছে। তুলে রমার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি মনে হয়, এটা কামড়াবার দাগ? কামড়ালে তো রক্তপাত হতো। এ তো যেন রক্ত জমে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'জানি।'

'তবে, কামড়াবার কথা বললে কেন?'

'চেষ্টা করে দেখছি, তোমার মনে পড়ে কী না।'

রমা আমার কাছে এসে আঙুলটা ছুঁয়ে দেখলো। একটু টিপে দিতেই, আর্তনাদ করে উঠলাম, 'উহ্, ব্যথা!'

রমা বললো, 'আঙুলটা বাঁকাতে পারছো না?'

চেষ্টা করে দেখলাম, পারলাম না। রমা ভুরু কুঁচকে, চিন্তিত মুখে বললো, 'ফ্রাকচার হয় নি তো? অফিসে যাওয়ার পথে, ডক্টর ব্যানার্জিকে একবার দেখিয়ে যেও। কী যে বলবো তোমাকে, হাতে কী করে লাগলো, তা পর্যন্ত তোমার মনে নেই।'

আমি বললাম, 'আজ অফিসে গিয়ে কলম ধরতে পারবো না, লিখতে সই করতেও পারবো না।'

রমা ঘর ছেড়ে, চলে যেতে যেতে বললো, 'ডক্টর ব্যানার্জি কী বলেন শোনো, যদি এক্সরে করতে বলেন, করো আর ওষুধ দিলে খেও। ব্যথা বাড়লে বাড়ি চলে এসো, অফিসে বসে থেকো না।'

রমার চলে যাওয়া শরীরের পিছন দিকে তাকিয়ে বললাম 'অফিসে কি আমি বসে থাকি নাকি?'

রমা ফিরে বললো, 'না, শুনেছি তোমাদের ব্যাংকও তো নাকি এখন প্রমীলারাজ্য হয়েছে।'

বলেই, বারান্দার ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি হাসলাম, রমা খবর কিছু কম রাখে না। গরম জলটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। বেশ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছি, নিয়মিত। এভাবে ভুগলে পাইলস্ অবশ্যম্ভাবী। দাঁত মেজে দাড়ি কামাবার সময় দেখতে পেলাম, আমার ঠোঁট দুটো যেন আজ অতিরিক্ত লাল দেখাচ্ছে। চোখ দুটিও এখনো বেশ লাল। কপালের সামনে, আর জুলফির কাছে কয়েকটি শাদা চুল দেখা যাচ্ছে। মুনাকে তুলে দিতে বলবো, মানে আমার মেয়েকে। ও বেশ পটপট করে তুলে দিতে পারে। আগেও দিয়েছে কয়েকবার। শাদাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল। চুল শাদা হওয়ার সঙ্গে কি শরীরের ক্ষমতা কমে যায়? শরীরের ক্ষমতা বলতে এক্ষেত্রে আমি একটি বিষয়ের কথাই ভাবছি, এবং মনে হয়, কথাটা আদপে সত্যি না। আমার তো মনে হয়, যতোদিন যাচ্ছে, যৌবনের আনন্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাড়ি কামাবার পরে, মাথার ওপরের সাওয়ারটা খুলে দিলাম। আহ্, শরীরটা যেন জুড়িয়ে যেতে লাগলো। বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম, বৃষ্টি ধারার মতো শরীর বেয়ে জল পড়তে লাগলো। সাওয়ার বন্ধ করে সারা গায়ে সাবান মাখলাম। নগ্ন না হয়ে আমি কখনোই চান করতে পারি না। রমা বলে, ওর পক্ষে নাকি অসম্ভব। বলে, 'যতোই একলা থাকি, একেবারে সব কিছু খুলে ফেলে আমি স্নান করতে পারি না।' এতোটা বয়স হলো, এতোদিন বিয়ে হয়েছে, 'ও এখনো আমার সামনেই কখনো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে না, বলে, আমার ভীষণ লজ্জা করে।'

ও যে মিথ্যা বলে, তা না। সত্যি পারে না। দাম্পত্য মিলনের সময়ে, আমার অবলোকন ওকে রীতিমতো বিব্রত করে তোলে।

আর বিরত হওয়া মানেই মিলনের বাধার সৃষ্টি করে। সে জন্য, আমিও বেশি অবলোকন থেকে বিরত থাকি।

অথচ আমার নিজের জীবনেই তো কতো বান্ধবীকে দেখলাম। সাওয়ারটা আবার খুলে দিয়ে, সাবানের ফেনা ধুতে ধুতে, অনেক নগ্ন শরীরের ছবিই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। আমি মনে করি না, তার মধ্যে কোনো বিকার আছে। নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য কদর্য, দুই-ই আছে। এক-একজনের নগ্নতা, রীতিমতো ভালগার বলে মনে হয়। সেটা বোধহয় নির্ভর করে, শরীরের গঠনভঙ্গি, এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্যে।

এখন আমার মনে পড়ছে, গতকাল রাত্রে যেন রূপাও নগ্ন হয়েছিল। ঝাপসা অস্পষ্ট মনে হলেও, আমি ওর সেই উজ্জ্বল শরীরের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, যার মধ্যে আছে একটা আনন্দের তীব্রতা। স্নিগ্ধতা বলবো না, কারণ রূপার মধ্যে স্নিগ্ধতার অভাব আছে। কিন্তু হাসি-মাখানো এমন একটা লজ্জার আবেশ ওর সারা গায়ে লেপে থাকে, যে লজ্জার মধ্যে একটু শাসনের ভ্রূকুটি, আবার ক্ষণে ক্ষণে হাসির নিক্বণ, এবং হঠাৎ নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অথবা যেন আদরের ব্যাপারটা. কিছুই না, এই সব মিলিয়ে, ওর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কিন্তু সত্যি কি রূপা কাল নগ্ন হয়েছিল, অথবা আমি ভুল ভাবছি!

কিছুই মনে করতে পারছি না। পান চুম্বন হাসি-ঠাট্টা ইয়ারকি, এসব কিছু কিছু মনে করতে পারছি, তারপরে একেবারে ব্লাক-আউট। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। ভালো না, এটা একেবারেই ভালো না, মদ্যপানটা না কমালে চলবে না। ডক্টর ব্যানার্জি অবিশ্যি আমাকে বলেছেন, সমস্ত মদ্যপায়ীরই এটা ঘটে না। এরকম একেবারে ভুলে যাওয়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যে-কোনো নেশাকে কেন্দ্র করেই ঘটতে পারে। কারণ একেবারে

ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা নাকি আমাদের মতো ব্যক্তির অবচেতনের মধ্যেই আছে। মদ্যপানকে কেন্দ্র করে, তা প্রকাশ পায়। এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। কেন না, আমার জীবনে এরকম একেবারে ভুলে যাওয়া কিছু নতুন না। অনেকবারই হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবী বা স্ত্রীর কাছে পরে অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু আমি কখনো মনে করতে পারি নি। বরং অবাক হয়েছি, বা নিজের ভুলে যাওয়া আচরণের জন্য লজ্জিত হয়েছি, কখনো কখনো নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি।

একে মনোম্যানিয়া বলে না। মনোম্যানিয়া অন্য জিনিস। ডক্টর ব্যানার্জি এর একটা কী নাম বলেছিলেন, এখন মনে করতে পারছি না। এটা নাকি, এক ধরনের ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে হয়। আমি তো বিশ্বাস করতে পারি না। বরং মনে থাকে না বলেই, আমার খারাপ লাগে, মনে মনে ভীষণ অনুশোচনা বোধ করি। কী করলাম, কী বললাম, কিছুই ঠিক মনে রাখতে পারছি না, ভাবলেই তো খারাপ লাগে। অন্তর থেকে আমি তা চাই না। অথচ ডাক্তারের অভিমত, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে এরকম হয়। এমন ইচ্ছা জীবনে পোষণ করেছি বলে তো মনে করতে পারি না। অবিশ্যি ডাক্তার বলেছেন, ক্রিয়াটা অবচেতনের, তাই রোগী নিজেও জানে না যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলে যায়। এভাবে বহুলোক নেশাগ্রস্ত হয়ে, নিজের সর্বনাশ করেছে। সারা জীবনে হয়তো মনে করতেই পারলো না, মত্তাবস্থায় কয়েক লক্ষ ব্ল্যাক টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে!

ভাবা যায় না। আর আমার চাকরিটা এমনই দায়িত্বের এরকম ব্যাপার আমার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে। তবে সৌভাগ্য এই, আমি কখনোই কাজের সময় মদ্যপান করি না। যদিও ব্ল্যাকআউট ব্যাপারটা আমার মাঝে-মধ্যে ঘটে, প্রত্যহের

কোনো ব্যাপার না, তথাপি আমি কাজের সময় কখনোই মদ্যপান করি না। করা সম্ভব না, করতে পছন্দও করি না। কাজের দায়িত্ব পালন না করাটা আমার কাছে অপরাধ বিশেষ।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে গিয়ে, আঙুলটায় ব্যথা করে উঠতেই, আমি আবার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তুলে দেখলাম। আশ্চর্য, কোথায় কী ভাবে লাগলো, কিছুই মনে করতে পারছি না। কী যে খারাপ লাগে, মনে হয়, মাথাটা ঠুকি, মস্তিষ্কের মধ্যে একটা শলাকা ঢুকিয়ে, স্মৃতি নামক পদার্থটা খুঁচিয়ে জেনে নিই, কী করে আমার এ আঙুলটায় লাগলো। একটু বাঁকাতে পারছি না, লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, আর সামনের দিকে ডগার কাছে নীল শিটা পড়েছে। বেশ ভালোভাবেই লেগেছে, অথচ লাগবার সময়ও খেয়াল হয় নি। এও কি বলতে হবে আমার ইচ্ছাকৃত ভুলে যাবার প্রবণতা থেকেই হয়েছে? ভগবান জানে।

তোয়ালেটা জড়িয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়েই এলাম। মুনা ইস্কুলে গিয়েছে, ওর মর্নিং ইস্কুল। দামু, আমার ছেলের ডাক নাম, ও এখন মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে। রমা নিশ্চয়ই আমার প্রাতঃরাশ তৈরিতে ব্যস্ত। যদিও কাজ করার লোকজন সবই আছে। কিন্তু আমার সব কিছু রমাই করে।

আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। জানলাগুলোতে পর্দা টানাই ছিল, না-থাকলেও বাইরে থেকে আমাদের এ দোতলার বিশেষ কিছু দেখা যায় না। দোতলা আর একতলার অংশ বিশেষ নিজের জন্য রেখে, বাকী অংশ ভাড়া দেওয়া আছে। ভাড়াটেরা আমার বাবার আমলের গুজরাতি পরিবার একটি, আর একটি বাঙালী। আমার কোনো ভাগীদার নেই এ বাড়িতে, বাবার আমি একমাত্র সন্তান। আমার ভাড়াটেরাও ভদ্রলোক, কোনো গোলমাল নেই।

আমি তোয়ালেটা খুলে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, গায়ে পাউডার মাখলাম। মুখেও সামান্য পাফ বোলালাম। পাশেই র‍্যাকের ওপর সবকিছু রয়েছে, রমা রেখে গিয়েছে। আমি জাঙিয়া পরে, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, আগে শার্ট পরলাম। টাই বাঁধলাম। তারপরে ট্রাউজারটা গলিয়ে, টুলের ওপর বসে জুতো মোজা পরলাম। মুশকিলটা হলো জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে। পারছি না। টাইটা তবু কোনোরকমে ম্যানেজ করেছি। ফিতে বাঁধা অসম্ভব। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যে এতো দরকারি, আগে কখনো মনে হয় নি। এ জন্যই বোধহয় লোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, বলতে চায়, দেখ আমার বুড়ো আঙুল আছে।

মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে দরজা খুললাম। খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, রমা রান্নাঘরে। গ্যাসের সামনে কিছু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রমু, নাথু কোথায় গেল?'

'নিচে, কেন?'

বলতে বলতেই ও খাবার ঘরে এল। আমার খাবার ওর হাতে। কর্নফ্লেক আর দুধের পাত্র। বললাম, 'জুতোর ফিতেটা কিছুতেই বাঁধতে পারছি না।'

রমা খাবার টেবিলে দিয়ে বললো, 'তুমি খাও, আমি বেঁধে দিচ্ছি।'

'তুমি কেন, নাথুই তো দিতে পারতো।'

'কেন, আমি কখনো তোমার জুতোর ফিতে বেঁধে দিই নি? আর নাথুর ফিতে বাঁধা তোমার পছন্দ হবে না, আমি জানি।'

রমা জুতোর ফিতে বেঁধে দিল। আমি কর্নফ্লেক্সে দুধ ঢেলে, চিনি মিশিয়ে নাড়তেই, টেলিফোন বেজে উঠলো। রমা বললো, 'তুমি খাও, আমি দেখছি।'

ওপরেই টেলিফোন। নিচে একটা বসবার ঘর থাকলেও, ঘনিষ্ঠদের নিয়ে ওপরেও একটা বসবার ঘর আছে। টেলিফোনটা সে ঘরেই আছে। এখন কে টেলিফোন করতে পারে? পারে

অবিশ্যি অনেকেই নানান কারণে। কিংবা আমার টেলিফোন না রমারই কল।

'তোমাকে ডাকছেন।'

বলতে বলতে রমা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'রাধা, সসপেনটা দাও, পোচটা করে ফেলি। টোস্ট সেঁকেছ?'

রাধা কি জবাব দিল, শোনবার অপেক্ষা না করেই বললাম, 'রমু, কে ডাকছেন বললে না?'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে জবাব এল, 'তোমার সেই মিসেস চক্রবর্তী, পৃথ্বীশ চক্রবর্তীর স্ত্রী।'

ললিতা? হঠাৎ এ সময়ে টেলিফোন কেন? ওরা স্বামী স্ত্রী আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং ললিতার সঙ্গে যে আমার একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, পৃথ্বীশ তা খুব ভালোই জানে। এমন কি ওর সামনেই দু-একবার ললিতাকে আদর করেছি, পৃথ্বীশ রাগ করে নি। এক ভাবে, ললিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা মেনে নিয়েছে। রমা ললিতার ওপর মোটেই খুশি না। সেই বিরাগটাই বোঝা গেল।

আমি উঠে গেলাম, বাঁ হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম, 'বলো।'

ওপার থেকে ললিতার সেই হাসি মাখানো, একটু রহস্য জড়ানো স্বর ভেসে এল, 'কী করছিলে? ব্রেকফাস্টে বসছিলে বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

'আন্দাজ করছিলাম। বিরক্ত হলে নাকি?'

'না, অফিসে যেতে হবে তো। সময় হয়ে এল!'

'কাল রাত্রে ও-ব্যাপারটা করলে কেন?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল রাত্রে? কাল রাত্রে কী করেছি?'

'মনে নেই?'

'না তো।'

'আমাদের বাড়ি এসেছিলে, মনে আছে?'

আরো অবাক হয়ে গেলাম, বললাম, 'তোমাদের বাড়ি? তোমাদের বাড়ি গেছলাম নাকি?'

ললিতাও অবাক হেসে বললো, 'মনে নেই একটুও?'

'অন গড বলছি, কিছু মনে নেই। কোনো খারাপ কিছু করি নি তো? মানে—তোমাকে পৃথ্বীশের সামনে—।'

'সেটা নতুন কিছু না। বাজে বকো না। কিন্তু কাল যা করলে, অবাক কাণ্ড। এলে, ও তো ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি তখনো জেগে। আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারলে না, হঠাৎ বললে, মাফ করে দিও। বলেই চলে গেলে।'

আমি একেবারে অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'অ্যাবসার্ড, হতেই পারে না।'

'আমি কি মিথ্যা কথা বলছি, না তোমার ভূত দেখেছি? আমি তোমার পেছন পেছন গেলাম। ডাকলাম, তুমি ফিরেও তাকালে না। নিচে গেলে, গাড়িতে উঠলে, স্টার্ট করলে, চলে গেলে।'

'সত্যি বলছো?'

'হোয়াট ডু য়ু থিংক, সকালবেলা শুধু শুধু মিথ্যে বলবো কেন? তোমার কিছুই মনে নেই?'

'একটুও না।'

'আশ্চর্য। ওর তখন ঘুম ভেঙে গেছে, জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, আমি বললাম। ও বললো, দ্যাখো প্রেমিকপ্রবর কোথাও থেকে হয় তো রিফিউজ্‌ড হয়ে ফিরে এসেছে। মাতাল অবস্থায় এখানে ক্ষমা চাইতে এসেছিল।'

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো টেলিফোনে। আমি বললাম, 'মোটেই না, আমি বরং কাল সন্ধ্যাটা যথেষ্ট ভালোই কাটিয়েছি।'

'কার সঙ্গে ?'

নামটা বলতে চাইলাম না। বললাম, 'বিশেষ কেউ না, অনেকের সঙ্গেই। তোমাদের ওখানে কত রাত্রে গেছলাম বলো তো ?'

'তা রাত্রি প্রায় এগারোটা তো হবেই।'

'স্ট্রেঞ্জ, কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'সে প্রমাণ আমি আগেও পেয়েছি, প্রথমে দুঃখ পেয়েছিলাম, এখন আর পাই না।'

ললিতার এ কথারও বিশেষ অর্থ আছে। এমন ঘটেছে, ওর সঙ্গে অ্যাফেয়ারের কথা আমি বেমালুম ভুলে গেছি। বললাম, 'আচ্ছা, বলতে পারো, আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যথার কথা কিছু বলেছিলাম কী না ?'

ললিতার অবাক-স্বর শোনা গেল, 'ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ব্যথা ?'

'হ্যাঁ, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি, আঙুলটা ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, নীলশিটে দাগ, বেশ ব্যথা। মনেই করতে পারছি না, কোথায় কখন কী ভাবে লাগলো।'

ললিতা হেসে উঠে বললো, 'চমৎকার! কোথায় গেছলে ভেবে ছ্যাখো! এখন আর কিছু বলবো না, ও-বেলা আমাদের এখানে আসবে নাকি ?'

'যাবো, পৃথ্বীশকে থাকতে বলো।'

'না, বলবো না।'

বলেই ললিতা লাইন কেটে দিল। তাজ্জব ব্যাপার! রূপার বাড়ি থেকে আবার ললিতাদের বাড়িও গিয়েছিলাম ? কিছুই মনে করতে পারছি না। অথচ নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছি। এ বিষয়ে রমার যথেষ্ট আপত্তি। আমাকে গাড়ি চালাতে দিতে চায় না, বিশেষ করে, ড্রিংকের পরে। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত একটাও

অ্যাকসিডেন্ট করি নি। এতো কথা ভুলে যা চাবি পাচ্ছি না। তু
ঘোরাতে, গিয়ার টানতে তো কখনো ভুল করি না। চালিয়ে আসি, গ্যারেজে ঢোকাই, নাথু গ্যারেজ বন্ধ করে। অবি... কী ভাবে ঢোকাই, এঞ্জিন বন্ধ করি, সব দিন মনে করতে পারি না। যেমন মনে করতে পারছি না, গতকালের কথা। অথচ গাড়ি ঠিকই গ্যারেজে ঢুকিয়েছি।

রমা আমার সামনে প্লেটে টোস্ট বাটার পোচ ছাড়াও, আর একটা প্লেটে গরম করা রোল্ রাখলো। দেখলেই চেনা যায়, চিকেন রোল্। অবিশ্যি চায়নিজ রোল না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন আবার চিকেন রোল্ কোথা থেকে এল?'

রমা বললো, 'এখন আসবে কেন, কাল রাত্রে তো তুমি নিজেই এনেছ। বললে, কী খেয়াল হলো, নিজামের রোল্ কিনে নিয়ে এসেছ। অথচ এক টুকরো মুখে দিলে না। বাড়ির খাবারও খেলে না।'

এ তো দেখছি আর এক বিস্ময়। নিজামের রোল্ মাঝে মাঝে খেতে ভালবাসি। কিন্তু গতকাল রাত্রে আবার রোল্ কিনতে গেলাম কখন? বাড়িতে যখন নিয়ে এসেছি, নিশ্চয়ই ফেরবার পথেই কিনেছি। তবু একদিনে এতগুলো ভুল হবার কারণ তো দেখছি না? অবিশ্যি হয় না যে কখনো, তা বলবো না। একবার এক মাড়োয়ারি বন্ধুর সামনে, গঙ্গার ধারে পান করতে করতে, হাতের ঘড়ি খুলে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপরে রাত্রে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলাম। আমার কিছুই মনে ছিল না। আমার সেই বন্ধু পরের দিন সকালবেলাই মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লী চলে গিয়েছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, ঘড়িটার কথা কিছুই মনে করতে পারি নি। সাত দিন পরে সেই বন্ধু ফিরে আসার পরে জানতে পেরেছিলাম, আমার কীর্তির কথা। কিন্তু কেন যে ঘড়িটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, তার কারণও আমার কাছে চিরঅজ্ঞাত। আমার

'কার সঙ্গে ?' [illegible] মি নাকি আমার ঘড়ির স্টিলের ব্যাণ্ডটা টেনে নামটা ব[illegible]

রমা বললো, 'রোল্ এনেছিলে, মনে করতে পারছো না তো ?'

লজ্জিত হেসে বললাম, 'না। কিন্তু রমু, আমি এখন আর এ রোল্ খাবো না।'

রমা বললো, 'জোর করবো না। কিন্তু কাল এত গুম হয়েছিলে কেন বলো তো ? কারোর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে নাকি ?'

অবাক স্বরে বললাম, 'না তো।'

রমা বললো, 'হয় তো তোমার মনেই নেই।'

হতে পারে, এ ব্যাপারে আমি একেবারে অসহায়। কিন্তু ঝগড়া করবার মতো কারোর সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল, মনে করতে পারছি না। ঝগড়া বিবাদ যে কখনোই করি না, তা বলবো না, তবে যাকে বলে রেয়ার, তা-ই। ঝগড়ার অভিযোগ আমার নামে শোনা গিয়েছে কালে-ভদ্রে। তাও পরে জানা গিয়েছে, আমি নিজে পায়ে পা দিয়ে কখনো ঝগড়া করি নি। করবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই করেছি। অনেককেই দেখেছি, তাদের পেটে দু'এক পেগ পড়লেই, তারা হঠাৎ বীরপুরুষ হয়ে ওঠে, সবাইকেই তুচ্ছজ্ঞান করতে আরম্ভ করে, অপমানজনক কথাবার্তা বলে। আমি সাধারণত সেইসব ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলি।

আমি হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি কফির কাপে চুমুক দিলাম। পৌনে দশটা বেজে গিয়েছে। কফি পান শেষ করেই, আমার ঘরে গিয়ে, আগে টেবিলের ড্রয়ার খুললাম। এ ড্রয়ারেই আমার গাড়ির চাবি, অফিসের চাবি আর পার্স থাকে। পার্স আর গাড়ির চাবি আছে, কিন্তু অফিসের চাবি নেই। গোটা ড্রয়ারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অফিসের চাবি পেলাম না। ভীষণ উদ্বেগের ব্যাপার। আমি গলা তুলে ডাকলাম, 'রমু—রমু।'

রমা আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'অফিসের চাবি পাচ্ছি না। তুমি কি জানো?'

রমা অবাক হয়ে বললো, 'না তো। তোমার পকেটে আমি যা-যা পেয়েছি, সবই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্যই করি নি, কী ছিল না ছিল।'

'অফিসের চাবিটা লক্ষ্য করো নি?'

'লক্ষ্য মানে কি, খেয়াল করি নি। যেমন রোজ তোমার প্যাণ্টের পকেট থেকে সব কিছু নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিই, সেই-রকমই রেখে দিয়েছি। রুমাল গেঞ্জি আর জাঙিয়া বাথরুমের বালতিতে ফেলে দিয়েছি।'

ব্যস্তভাবে বললাম, 'ভ্যাখো ভ্যাখো, রুমালের সঙ্গে অফিসের চাবি চলে গেছে কী না।'

রমা যেতে যেতে বললো, 'অসম্ভব। সে-সব কখন ধোয়া হয়ে গেছে। চাবি পেলে নাথু আমাকে বলতো না?'

আমি আবার ভালো করে খুঁজতে লাগলাম। অন্যান্য ড্রয়ারেও দেখলাম। ওয়ারড্রব খুলে হ্যাঙারে ঝোলানো প্রতিটি ট্রাউজার আর জামার পকেট ঘেঁটে দেখলাম। চাবি নেই। তার মানে, অফিসের কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। রমা এসে বললো, 'না, নাথু বালতির মধ্যে কোনো চাবিই দেখতে পায় নি।'

অসহায়ভাবে বললাম, 'কী করি বলো তো, সাংঘাতিক ব্যাপার। এ চাবি না পেলে—'

উদ্বেগে আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। রমা বলে উঠলো, 'তবু তো ড্রিংক করা ছাড়বে না। যার এত দায়িত্বের কাজ—'

আমার রাগ হয়ে গেল, বলে উঠলাম, 'তুমি আর এখন অ্যাডভাইস দিও না।'

বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম। ডুপলিকেট পেতে হলেও

এই চাবি ছাড়া আমি তা বের করতে পারবো না। এখন রূপার বাড়ির কথাই মনে পড়ছে কেবল। গতকাল রাত্রে ওর বাড়িতে বোধহয় ট্রাউজার খুলে ফেলেছিলাম। তখন হয়তো চাবির রিঙ পড়ে গিয়ে থাকবে। নিচে নেমে দেখলাম, নাথু গ্যারেজের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আগে গাড়ির দরজা খুলে, সীটের ওপর, নিচে, সবখানে দেখলাম, চাবিটা আছে কী না। নেই। আমার উদ্বেগ বাড়তে লাগলো। গাড়ি বের করে নিয়ে ছুটলাম।



রূপার ফ্ল্যাট বাড়ি একটা বিরাট ম্যানসন, সফাস্টিকেটেড পাড়ায়। গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় গিয়ে দেখলাম, একটা পুলিসের জীপ আর ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক, এখন আমার এসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। আমি গাড়ি পার্ক করে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে লিফটে উঠলাম। ও থার্ড ফ্লোরে থাকে। সেখানে উঠে, রূপার ফ্ল্যাটের দরজাটাতেই দেখলাম, পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভিতরে ঢুকতে যাবার মুখেই একজন কনেস্টবল আমাকে বাধা দিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

কনেস্টবল বললো, 'খুন।'

'খুন? কে খুন হয়েছে।'

'এ ফ্ল্যাট মে যো লেডি থি, ক্যায়া মিসেস রূপা চৌধুরী উন কি নাম।'

আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো। রূপা খুন? কী

করে তা সম্ভব? কখন কী ভাবে? প্রায় এক মিনিট কিছু বলতেই পারলাম না। তারপরে পকেট থেকে আমার কার্ড বের করে, কনেস্টবলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্দর মে কোই অফিসার হ্যায়?'

'হাঁ, ডি ডি সাব হ্যায়।'

'উনকো এ কার্ডঠো দিজীয়ে, বলিয়ে ম্যায় উনকে সাথ বাত করনে মাংতা।'

'ঠার যাইয়ে।'

বলে সে আমার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে ভিতরে চলে গেল। পর্দাটা ঢাকা। ভিতরে লোকজনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু, কী ব্যাপার? রূপা খুন? রূপার ফ্ল্যাটে কোনো চাকর-বাকর নেই। ও এলে সাময়িকভাবে কেউ কাজ করে। রাত্রে [illegible] না। এই ম্যানসনেরই কোনো লোক কাজ করে, এবং সে-রকম এখানে পাওয়াও যায়। ও যখন আসে, নিজেই গ্যাসে একটু রান্না-বান্না করে। একটা ফ্রিজও আছে। সাময়িকভাবে বহাল করা সে লোকটা কাল কখন গিয়েছে বা কতোক্ষণ ছিল, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।

অফিসার পর্দা সরিয়ে, মুখ বের করে বললেন, 'আপনি এ কে মিত্র ব্যাংক ম্যানেজার?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

আমি ওঁর সঙ্গে ভিতরে গেলাম। সামনেই বসবার ঘর, পাশে ডাইনিং স্পেস্। তারপরে দুটি শোবার ঘর, সংলগ্ন বাথরুম। বসবার ঘরে কয়েকজন পুলিসের লোক ছাড়াও, বোধহয় ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, মনে হয় সে ব্যক্তি থানার ও সি। ডাক্তার বলে যাঁকে সন্দেহ করলাম, তার কারণ, তিনি তখন

বলছিলেন, 'আমার মনে হয়, শী হ্যাজ বীন কিল্ড ফ্রম নাইট নাইন ট মিডনাইট। সেটা ঠিক জানা যাবে ময়না তদন্তের পরে।'

আমাকে যে অফিসার নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকলেন, ও সি-কে বললেন, 'ইনি ব্যাংক ম্যানেজার মিঃ এ কে মিত্র।'

ও সি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওহ্? আপনি? আপনি খবর পেয়েছেন?'

বললাম, 'না তো। আমি কোনো খবরই পাই নি। আমি এসেছিলাম একটা বিশেষ দরকারে।'

'মিসেস চৌধুরীর কাছে?'

'হ্যাঁ। আমি তো কাল সন্ধ্যেয় ওর এখানে এসেছিলাম, আমার—।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমার পাশে দাঁড়ানো অফিসার বলে উঠলেন, 'আপনি কাল ইভনিং-এ এসেছিলেন এখানে। মানে মিসেস চৌধুরীর কাছে?'

'হ্যাঁ। শী ইজ মাই ফ্রেণ্ড। বম্বে থেকে তিন দিন আগে এসেছে। এসেই আমাকে টেলিফোন করেছিল। গতকাল সন্ধ্যেয় আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু কনেস্টবলের মুখে যা শুনলাম—'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ, মিসেস চৌধুরী লাস্ট নাইটে খুন হয়েছেন। আপনার হাতে সময় থাকলে একটু বসুন না।'

আমি তখন মনে মনে উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, বিস্মিত। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। বললাম, 'বুঝতেই পারছেন, অফিসে যাবার পথে আমি এখনে এসেছিলাম।'

অফিসার বললেন, 'বোধহয় চাবির খোঁজে?'

অবাক হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা কি করে জানলেন?'

'আপনার ব্যাংকের নাম লেখা আছে চাবির গায়ে। সেই চাবির রিং চাবিসহ আমরা মিসেস চৌধুরীর শোবার ঘরে পেয়েছি। তাতে

অনুমান করছিলাম, ব্যাংকের কোনো লোক মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।'

আমি একটু আশ্বস্ত হলাম চাবির সন্ধান পেয়ে। বললাম, 'চাবির জন্যই দুশ্চিন্তা নিয়ে ছুটে এসেছিলাম, সেটা পাওয়া গেছে, কিন্তু যা শুনলাম, তার পরে আর কিছু ভাবতেই পারছি না। আমি কি রূপাকে একটু দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, চলুন। আমাদের ফটোগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট ওঁরা সব কাজ করছেন। আপনি চলুন।'

আমি অফিসারের সঙ্গে রূপার শোবার ঘরে গেলাম। এসেই থমকে দাঁড়ালাম। (সেই উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী রূপা, হাসিতে ঝলকানো, পুরুষের রক্ত পাগল করা রূপা,) ওর শোবার খাটে হাত এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। (বুকের জামা যেন কেউ টেনে ছিঁড়ে খুলে দিয়েছে, ব্রা নেই, শাড়িটা এলোমেলো, সায়া অনেকখানি উঠে আছে।) গলার খাঁজ থেকে, রক্তের ধারা বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে, এখন শুকনো। ওর সেই কামনার আগুন ধরানো ঠোঁট খোলা, জিভটা যেন ভিতরে এলিয়ে রয়েছে। চোখ বোজা। ওর ঘাড় অবধি চুল ছড়ানো। ওর বলিষ্ঠ খোলাবুকের দিকে যেন তাকিয়ে থাকা যায় না।

এখনো হুইস্কির বোতল গেলাস সোডার বোতল, সবই টেবিলের ওপর রয়েছে। আমরা এ ঘরেই গত রাত্রে বসেছিলাম। আমরা সোফা চেয়ারে বসি নি। ঘনিষ্ঠভাবে বিছানাতেই বসেছিলাম। সেইজন্য কাচের নিচু টেবিলটা খাটের কাছে টেনে আনা হয়েছিল। আমি দেখলাম, ফটোগ্রাফার সমস্ত ঘরটার নানান ভাবে ফটো নিচ্ছে। রূপার ফটো বোধহয় আগেই নিয়েছে। এখন সে স্কাইলাইটের ফটো নিচ্ছে। সেখানে স্কাইলাইটের কাঁচ খোলা, কয়েকটা দাগ, পায়ের দাগের মতো দেওয়ালে লেগে রয়েছে, অথচ ঠিক যেন পায়ের

দাগ বলে মনে হয় না। ওখান দিয়ে কোনো লোকের পক্ষে ঢোকা সম্ভব বলে মনে হয় না।

সে-সব যাই হোক, আমার চোখ আবার রূপার দিকেই ফিরে গেল। আমি অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করে মারলো ?'

অফিসার আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'সেই অস্ত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে আমাদের ডাক্তারের অনুমান, কণ্ঠনালিতে ফর্ক ঢুকিয়ে মার্ডার করা হয়েছে।'

'মানে, কাঁটা চামচ ?' বলে আমি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণাবোধে চোখ বুজলাম। বললাম, 'চলুন ও ঘরে যাই।'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ চলুন। আপনার চাবির গোছা আমার কাছেই আছে, এই নিন।'

বলে অফিসার আমাকে চাবির রিঙ দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'চাবিটা কোথায় পেলেন ?'

অফিসার বললেন, 'টেবিলের ওপরেই ছিল।'

আমরা বসবার ঘরে এলাম। ও সি বললেন, 'বসুন মিঃ মিত্র।'

আমার পক্ষে এখন বসা সম্ভব না, কারণ আমাকে অফিসে পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও একবার যেতে হবে। চাবিগুলো অন্তত পৌঁছুনো দরকার। আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে আপনাদের কথা বলা দরকার, আমার নিজেরও অনেক কিছু জানার বা বলার আছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে একবার অফিসে যেতেই হবে।'

অফিসার বললেন, 'যান না, আপনি অফিস থেকে ঘুরে আসুন ততক্ষণে আমরা এদিককার কাজগুলো দেখছি। ইন ফ্যাক্ট, মিসেস চৌধুরী সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এই ম্যানসনের কেয়ারটেকারের কাছে কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি মিসেস চৌধুরী এই ফ্ল্যাট কিনেছেন। তিনি বম্বেতে কি একটা চাকরি

করেন, এক মাস দু-মাস অন্তর কলকাতায় আসেন, চার-পাঁচ দিন থাকেন, আবার চলে যান। কখনো কখনো ওঁর সঙ্গে ওঁর ছেলেও আসে।'

আমি বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন, তবে অল্ দ্য ডিটেল আমি আপনাদের এসে বলবো, এখন যাচ্ছি। মনে হয় আধঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসতে পারবো।'

অফিসার বললেন,'হ্যাঁ তাই আসুন, আপনি একজন রেসপনসিবল ম্যান, হেড অফিসের ম্যানেজার, আপনাকে যেতেই হবে।'

আমি বেরিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে আশেপাশের ফ্ল্যাটে ব্যাল্-কনিতে মহিলা পুরুষদের ভিড় জমেছে। আমি লিফট-এ নিচে এসে গাড়ি নিয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ব্যাংকে গেলাম। আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমার অ্যাসিস্টাণ্ট আর ক্যাশিয়ার দুজনেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওঁরা ইতিমধ্যে আমার বাড়িতেও ফোন করেছিলেন। আমি যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে ওঁদের হাতে চাবি দিয়ে বললাম, 'আমার বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দেবেন, আমি অফিসে এসেই আবার বেরিয়ে গেছি, তা না হলে আমার স্ত্রী ভাববেন, কেননা, উনি জানেন এতক্ষণে আমার অফিসে আসা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার কথাটা বলবেন না, ভয় পাবেন।'

অ্যাসিস্টাণ্ট আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, চলে যান।'

৫

আমি আবার রূপার ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলাম, আর ওর সেই খাটে পড়ে থাকা মূর্তিটা চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। কে এমন কাজ করতে পারে? ওর প্রাক্তন স্বামী সুদীপ চৌধুরী আবার বিয়ে করেছে। ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক যেমন নেই, তেমনি কোনো তিক্ততার কথাও শুনি নি। রূপার কোনো শত্রু থাকতে পারে বা ছিল, ওর মুখে কোনো দিনের জন্য শুনি নি। আর এই রূপার সঙ্গে গতকালই আমি—উহ্, আমি কী না করেছি। ওকে পেলে যে আমি পাগল হয়ে যেতাম। প্রতিটি হাসির স্পর্শের আদরের প্রতিদান দিতে ওর জুড়ি মেয়ে বোধহয় আর কেউ ছিল না। আর আশ্চর্য, গতকালই আমি অফিসের চাবি ভুল করে ওর ফ্ল্যাটেই ফেলে গেলাম?

আমি গাড়ি পার্ক করে লিফট-এ থার্ড ফ্লোরে উঠলাম। ডি ডি আমার অপেক্ষাতেই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন। যাওয়া মাত্র অভ্যর্থনা করলেন—'আসুন আসুন, আপনার জন্য আমরা র‍্যাদার অ্যাংসাস্‌লি ওয়েইট করছি। আমাদের ডক্টর রয়েছেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আপনার প্রিন্ট নেবার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আমি অফিসারের সঙ্গে ভিতরে গেলাম। বললাম, 'নিশ্চয়ই আমার হাতের ছাপ শোবার ঘরের সবখানেই পাবেন। অন্তত

গেলাসে বোতলে টেবিলে বিছানায়, এমন কি—আই মীন রূপার শরীরেও পেতে পারেন।'

অফিসার বললেন, 'আপনার এই স্পষ্টবাদিতার জন্য ধন্যবাদ মিঃ মিত্র। আপনি বসুন।'

আমি একটা সোফায় বসলাম। ও সি তখন ভিতরে কাজ করছিলেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এসে আমার দু-হাতে কালো রঙ লাগানো রোলার চেপে চেপে ঘোরালেন। তারপরে একটা বড় কাঁচের টুকরোয় দুটো হাতেরই ছাপ নিলেন। সেই কাঁচ ফটো-গ্রাফারকে দিয়ে বললেন, 'নেগেটিভ আর প্রিন্ট আপনি আজকেই দেবার চেষ্টা করবেন।'

ফটোগ্রাফার বললেন, 'আজই পেয়ে যাবেন।' বলে ফটোগ্রাফার আমারও দুটো ফটো তুলে নিয়ে হেসে বললেন,'ডোণ্ট মাইণ্ড, থ্যাংকু।'

আমি বললাম, 'থ্যাংকু।'

ও সি এসে ডি ডি-কে বললেন, 'এদিককার কাজ তো শেষ : ডেডবডি কি রিমুভ করবো স্যার?'

অফিসার বললেন, 'হ্যাঁ, করে দিন, তারপরে আমরা মিঃ মিত্রের সঙ্গে বসে একটু কথা বলে নিই।'

ও সি তাঁর অধস্তন ইনস্পেক্টরকে ডেকে ডেডবডি রিমুভ করতে বললেন। আমাদের সামনে দিয়েই রূপার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলো। অবিশ্যি এখন ওকে বেড-শীট দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এমন কি মুখটাও ঢাকা। শেষবারের জন্য আর মুখখানি দেখা হলো না।

তারপরে ডি, ডি, বললেন, 'এবার বলুন মিঃ মিত্র, মিসেস চৌধুরী সম্পর্কে আপনি কী জানতেন।'

আমি মোটামুটি রূপার অতীতের কথা বললাম, এবং আমার সঙ্গে ওর স্বামীর মারফত প্রথম পরিচয়, পরবর্তীকালে ওদের দাম্পত্য

জীবনের জটিলতা, পরিণতি বিবাহবিচ্ছেদ, ওর চাকরি, যা-যা জানতাম সবই বললাম। ডি ডি; ও সি এবং ডাক্তার তিনজনেই আমার কথা শুনলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কখন জানলেন, কী ভাবে জানলেন, জানতে পারি?'

ও সি বললেন, 'নিশ্চয়ই। মিসেস চৌধুরীর যে টেম্পরারি সারভেন্ট, যে এ ম্যানসনে বলতে গেলে, অনেকের ফ্ল্যাটেই রিসিভার হিসেবে কাজ করে, সে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় দরজা খোলা, মিসেস চৌধুরী ও-ভাবে মরে পড়ে আছেন। ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে কেয়ার টেকারকে খবর দেয়। কেয়ার টেকার আমাদের জানায়!'

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'দরজা খোলা থাকবে কেন। চাকরটারই তো রূপাকে খেতে দিয়ে বিদায় নেবার কথা। ওর তো রাত্রে ফ্ল্যাটে থাকবার কথা নয়?'

ও সি বললেন, 'সে কথা ও বলেছে। কিন্তু ওর বক্তব্য হচ্ছে, মিসেস চৌধুরী তাঁর কোনো পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে ড্রিংক ক'রে খুবই মাতা-মাতি করছিলেন। ও তখন রান্নাঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ঘুম ওর ভোরবেলা ভাঙে। তারপরে ও এসব দেখতে পায়। অবিশ্যি ওকে আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি।'

ডি ডি বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মিঃ মিত্র, পুরুষ-বন্ধুটি বোধহয় আপনিই?'

অস্বস্তি বা লজ্জা হলেও এক্ষেত্রে কোনো কথা গোপন করা উচিত নয় জেনেই আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওর কাছে এসেছিলাম। আর কেউ আসতে পারে বলে তখন ওর কাছে কিছু শুনি নি। আর আমার মনে হয়, আমি ছাড়া কলকাতায় ওর বোধহয় আর কোনো পুরুষ-বন্ধু নেই।'

ডি ডি বললেন, 'এটা একান্তই আপনার ধারণা।'

বললাম, 'হ্যাঁ, নিজের ধারণার কথাই আমি বলছি।'

'আপনারা হু'জনেই কি কাল ড্রিংক করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস চৌধুরী কি নিয়মিত ড্রিংক করতেন?'

'নিয়মিত কী না জানি না, কলকাতায় এলেই আমরা হু'জনে একসঙ্গে ড্রিংক করতাম। কিন্তু রোজ না। ও যেদিন আমাকে ডাকতো, সেইদিন। বাকী দিন ও একলা একলা ড্রিংক করতো বলে মনে হয় না।'

'বোতল দেখে মনে হলো, প্রায় পুরো একটা বোতলই আপনারা শেষ করেছেন।'

'তা হতে পারে, কারণ শেষের দিকে আমার প্রায় কিছুই মনে নেই।'

এ সময়ে আমার আঙুলের কথাটা একবার মনে পড়লো। কিন্তু আমি সে-কথা আর তুললাম না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছুই মনে নেই মানে কী, আপনি চলে যাবার সময় মিসেস চৌধুরী কী করছিলেন বা আপনাকে কী ভাবে বিদায় দিয়েছেন, কিছুই মনে নেই?'

আমি সত্যি কথাই বললাম—'কিছুই মনে নেই। আমি আপনাদের কাছে গোপন করতে চাই না, আমার এই পর্যন্ত মনে আছে, আমরা হু'জনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছলাম, তারপরে কখন এক সময়ে চলে গেছি কিছুই মনে করতে পারি না।'

ডি ডি ও ও সি এবং ডাক্তার তিনজনেই পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। স্পষ্টতঃই তাঁদের চোখে যুগপৎ সন্দেহ এবং বিস্ময়। ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি রাত্রে ক'টার সময় এখান থেকে গেছেন আপনার মনে নেই?'

'না, আমি ঘড়ি দেখি নি, দেখার কথাও আমার মনে ছিল না।'

'আপনি কি ভাবে গেলেন ? নিশ্চয়ই আপনার গাড়ি ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার ছিল ?'

'না, আমি নিজেই গাড়ি চালিয়েছি।'

'অথচ আপনার কিছুই মনে নেই ?'

'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন অফিসার, ড্রিংকের পরে আমার কখনো কখনো এমন একটা সময় আসে, আমি কিছুই মনে করতে পারি না। টোটালি ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়।'

ডাক্তার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'নট অ্যাবসার্ড, এরকম হতে পারে।'

ও সি অবাক স্বরে বললেন, 'ব্ল্যাকআউট অবস্থায় নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় ?'

ডাক্তার বললেন, 'যাওয়া যায়—ওটা একটা স্বপ্নের ঘোরের মতো, যেন ঘুমন্ত অবস্থায় একটা লোক অভ্যাসবশত সব কিছুই করে যাচ্ছে।'

আমি ললিতা চক্রবর্তীর কথা এবং চিকেন রোলের কথাও ওঁদের বললাম। এবং আজ সকালে কেউ কিছু না বললে যে সবই আমার অজ্ঞাত থেকে যেতো, সেকথাও বললাম। ডি ডি এবং ও সি অবাক, ডাক্তারের মুখ গভীর চিন্তিত। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, অবিশ্যিই ইংরেজিতে, 'গতকাল রাত্রে, মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কি আপনার দৈহিক মিলন ঘটেছিল ?'

অস্বস্তি আর লজ্জায় আমার কান গরম হয়ে উঠলো। বললাম, 'সঠিক মনে করতে না পারলেও অসম্ভব না, কেননা ওর সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক ছিল। জানি না, আপনারা আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন, কিন্তু—।'

ও সি বলে উঠলেন,'এর দ্বারা আপনার চরিত্রহীনতারই প্রমাণ হয়।'

ডি ডি প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'ওহ্, য়ু প্লীজ কীপ কোয়ায়েট। ওঁর চরিত্রের ভালো মন্দ নিয়ে আমাদের ভাববার কিছু নেই। আমরা মিসেস চৌধুরীর মার্ডারের বিষয়টাই জানতে চাই। য়ু আর নট দ্য পারসন্, হু উইল কমেন্ট হোয়াট ইজ্ হি। লেট আস্ হিয়ার, হোয়াট হি সেস্।'

আমি ও সি-এর মুখের দিকে ফিরেও তাকালাম না। এসব লোকের চরিত্র এবং মন আমি জানি। এরা কারোকে অপমান করার সুযোগ পেলে তা ছাড়ে না। সেটা কেবল পদাধিকারের বলে না, এদের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ডি ডি বললেন, 'বলুন মিঃ মিত্র, আপনি কি বলতে চাইছিলেন।'

আমি বললাম, 'কিছুই না। আমি বলতে চাইছি আপনারা আমাকে যাই ভাবুন, আমি আপনাদের কাছে কোনো কথাই গোপন করতে চাই না।'

ডি ডি বললেন, 'সেজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ মিত্র। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, আই মীন্ মিসেস চৌধুরীকে নিয়ে?'

'আমি তো মনে করতে পারছি না।'

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এরকম ব্ল্যাকআউট কি প্রায়ই হয়?'

'প্রায়ই বলবো না। মাঝে মধ্যে হয়ে যায়।'

'আপনি মিসেস চৌধুরীকে খুবই ভালবাসতেন?'

এমন একটা সময়েও আমি একটু না হেসে পারলাম না। বললাম, 'ওকে আমার খুবই ভালো লাগতো। এমন না যে ওকে আমি কখনো বিয়ে করার কথা ভেবেছি, রূপাও সেরকম কিছু ভাবতো না। তাছাড়া আমার নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

'আপনার স্ত্রীর থাকতে পারে ?'

'অভিযোগ আছে কি না জানি না তবে বান্ধবীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতায় মনে মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পায়।'

ওঁরা তিন জনেই চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ডি ডি ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার বললেন, 'আমার ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

ডি ডি বললেন, 'আপাতত আমারও না। আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন ?'

ডি ডি ও সি-এর দিকে তাকালেন। ও সি নোটবুক বের করে আমার বাড়ির ঠিকানা, ফোন নাম্বারও টুকে নিলেন। আমি ডি ডি-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কি ভাবছেন, আমি জানতে পারি ?'

ডি ডি বললেন, 'আমরা ভাববার মতো এখনো কিছু পাই নি। প্রথমত মোটিভ অব দ্য মার্ডার জানা দরকার, কেন না ভ্যালুয়েবল্‌স্‌ কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে না। আর কলকাতার এ ফ্ল্যাটে বোধহয় মিসেস চৌধুরী মূল্যবান কিছু রাখতেন না।'

বললাম, 'আমিও তাই জানি। কেননা, ফ্ল্যাটটা তো খালিই পড়ে থাকে। ওর ইচ্ছা, কলকাতায় একটা ভালো চাকরি পেলে, এখানে এসে থাকতো।'

ডি ডি বললেন, 'টাকা-পয়সা যা ওঁর ব্যাগে পাওয়া গেছে তা প্রায় শ' ছয়েক টাকা। আগামী পরশু দিনের মর্নিং ফ্লাইটের বম্বের একটা টিকিট। এমন কি ওঁর ঘড়ি বা আঙুলের আংটি কিছুই খোয়া যায় নি। এতে বোঝা যাচ্ছে, টাকার লোভে ওঁকে কেউ খুন করে নি। ফিজিক্যালি টর্চাড হয়েছিলেন এটা বোঝা গেছে—কেননা ওঁর গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, যেন কেউ টেনে ছিঁড়েছে। বুকে আঁচড়ানো দাগও দেখা গেছে। অথচ আপনার সঙ্গে ওঁর রিলেশন যা ছিল—'

আমি না বলে পারলাম না, রূপার জামাকাপড় নিয়ে টানাটানি করার কোনো কারণই আমার দিক থেকে থাকতে পারে না। পরিষ্কার মনে করতে না পারলেও, আমি প্রায় ঝাপসাভাবে যেন মনে করতে পারছি—কাল রাত্রে ও সম্পুর্ণ ন্যুড হয়েছিল আমার সামনে। আমি চলে যাবার পরে হয়তো ও সায়া শাড়ি জামা পরে থাকবে।

ও সি বলে উঠলেন, 'কিন্তু সেটা প্রমাণ করা যাবে কেমন করে?'

বললাম, 'আমার পক্ষে সম্ভব না। আগেই বলেছি আমি কিছু মনে করতে পারছি না।'

ডি ডি বললেন, 'অন্য একটা সম্ভাবনার কথাও আমরা ভুলতে পারছি না, কারণ স্কাইলাইট দিয়ে কারোর আসাটা অসম্ভব না। তবে খুবই কঠিন। মিসেস চৌধুরীর শোবার ঘরের স্কাইলাইটের কাঁচটা বন্ধ ছিল না, দেয়ালে কয়েকটা দাগও দেখা গেছে। মই বেয়ে উঠে সে দাগগুলো আমরা দেখেছি, ফটোও নিয়েছি। অ্যাট্ অল্ সেগুলো কারোর পায়ের দাগ কি না, বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে ফরেনসিক রিপোর্টের ওপর। ভদ্রমহিলার কলকাতায় কোনো আত্মীয়স্বজন আছে?'

আমি মনে করতে পারলাম না। রূপা একবার যেন বলেছিল, কলকাতায় ওর বাবা আর পিসীমা থাকেন। কিন্তু কোথায় থাকেন তা কখনো বলে নি বা তাঁদের ঠিকানাও আমাকে কখনো বলে নি। আমি সে কথা বললাম। তারপরে বললাম, 'তবে আপনাদের একটা কাজ করা উচিত, রূপার বম্বের অফিসে এবং কলকাতার ব্রাঞ্চ অফিসে একটা খবর দিলে ওর বিষয়ে আরো কিছু জানতে পারবেন। ওর একটি দশ বছরের ছেলে আছে। তাকে খবরটা কেমন করে জানানো যাবে বা তার দায়িত্বই বা কে নেবে বুঝতে পারছি না।'

ডি ডি বললেন, 'মিসেস চৌধুরীর প্রাক্তন স্বামী কি তাঁর সন্তানের দায়িত্ব নেবেন না?'

বললাম, 'বলতে পারি না। হয়তো নিতেও পারে, আফটার অল্ নিজেরই ছেলে তো।'

ও সি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনি গত রাত্রে যে পোশাক পরে এখানে এসেছিলেন, সেগুলো এখন কোথায়?'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'আপনার সন্দেহ অনুযায়ী বলতে হয় এগুলো আমি পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেছি। তবে আপনি এখনই আমার বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললেই তিনি সে-সব পোশাক আপনাকে দেখাতে পারবেন। পাবেন না কেবল গেঞ্জি রুমাল আর জাঙিয়া, কেন না ওগুলো ধুয়ে ফেলা হয়েছে এতক্ষণে। অর্থাৎ আমি বলছি আপনি যদি কোনো চিহ্ন খুঁজতে চান—'

ডি ডি বলে উঠলেন, 'এনাফ মিঃ মিত্র। ও সি যদি দেখতে চান তিনি পোশাকগুলো দেখে আসবেন। আপনাকে আর আটকাতে চাই না। তবে আমাদের কোনো সাহায্যের দরকার হলে আপনার দ্বারস্থ হবো।'

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'ওহ্ শ্যুর শ্যুর এনি টাইম, আয়াম অ্যাট যোর সার্ভিস। রূপার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য যে কোনোরকম সাহায্য দরকার আমি করবো।'

আমি এখন আর কোনো তাড়াহুড়ো করছি না। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার থেমে ডি ডি-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা চাকরটা সারা রাত্রে ঘুম থেকে একবারও ওঠে নি?'

'না। তাই তো বলছে সে।'

আমার ভুরু কুঁচকে উঠলো। আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটার কাজ-কর্ম শেষ করে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবার কথা। সারা রাত্রি রান্নাঘরে

ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল? ভাবতে ভাবতে আমি ব্যালকনি দিয়ে, বারান্দা দিয়ে এগিয়ে লিফট-এ নিচে নামলাম, গাড়ি নিয়ে ব্যাংকের দিকে চললাম। রমাকে একবার টেলিফোন করবো ভাবলাম। কিন্তু থাক। ও সি লোকটা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, ভাববে আমি আগে থেকেই স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছি। রাসকেল, আমাকে বলে চরিত্রহীন। যেন কলকাতার কারোর কিছু জানতে আমার বাকী আছে। অফিসে আমার অ্যাসিস্টান্ট এসে আমার সঙ্গে কথা বললো। তাকে সব কথাই বললাম। এ-ও বললাম, সে যেন অফিসে এসব নিয়ে কোনোরকম আলোচনা না করে। সে করবে না বললেও, করবেই আমি জানি। তবু আমি বললাম, যাতে সবাই ভাবে, আমি ঘটনাটা নিয়ে লুকোচুরি করতে চাইছি না, কারণ আমার মনের দিক থেকে তার কোনো কারণ নেই।

আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের আমার এক অফিসার বন্ধুকে টেলিফোন করলাম। সে একজন এ ডি সি। তাকে পাওয়া গেল। আমি মুখ খোলবার আগেই সে বললো, 'সব খবর আমার কাছে পৌঁছে গেছে এইমাত্র। তোমার বিষয়ে খোঁজ-খবর চলছে।'

আমি বললাম, 'তা চলুক, সে-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তোমাকে ফোন করছি এজন্য, এটা একটা ভয়ংকর আশ্চর্য ব্যাপার। এ খুনটার কিনারা করতেই হবে।'

'নিশ্চয়ই। তা মক্ষীরানীটির সঙ্গে কাল কতোক্ষণ ছিলে?'

'তুমি ভালোই জানো, সামটাইস্ আমার কী রকম হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়। গত রাত্রেও তাই হয়েছিল। আমি যে রূপার বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছি, কী ভাবে বাড়ি ফিরেছি কিছুই মনে করতে পারছি না। আই হ্যাভ কমন সেন্সেস যে এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা যায় না কারণ আমি কাল রূপার সঙ্গে ড্রিংক করেছি, আরো অনেক কিছুই। ভাবো, পুরো একটা স্কচের বোতল

শেষ করেছি এবং ধরেই নিচ্ছি বেশিটা আমিই টেনেছি তা না হলে ব্ল্যাকআউট হতো না। কিন্তু রূপাকে মারবার বদলে কেউ যদি সারা জীবন ওর বুকে মুখ রেখে আমাকে পড়ে থাকতে বলতো আমি তাই পারতাম।'

'তার মানে, তুমি বলছো মার্ডারের পেছনে তোমার কোনো মোটিভই থাকতে পারে না।'

হেসে বললাম, 'আমি কিছুই বলছি না ভাই, তোমরা পুলিসরা যা ঠিক বুঝবে তাই করবে, আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এক মাস দু-মাস অন্তর অন্তর ওকে একটু পেতাম, ওকে কেউ খুন করতে পারে ভাবতেই পারি না।'

বন্ধু বললো, 'অনেক কিছুই ভাবা যায় না। মানুষ এক বিস্ময়কর জীব।'

'তা যা বলেছ। যাই হোক তোমাকে ফোন করার উদ্দেশ্য আর কিছু না ব্যাপারটা যাতে ঠিক মতো ইনভেসটিগেট হয় সেটা করো।'

বন্ধু বললো, 'এটা ঠিক আমাদের ব্যাপার না, যা করবে লালবাজার আর আই বি ডিপার্টমেণ্ট। এনি হাউ আমি খবর রাখবো, ডি আই জি-র সঙ্গেও কথা বলবো। আজ সন্ধ্যেয় কোথায়?'

উদাস স্বরে বললাম, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাবছি বাইরে কোথাও বসবো না, পৃথ্বীশের বাড়িতে গিয়ে বসবো।'

বন্ধু ঠাট্টা করে বললো, 'ললিতার কাছে যাবে বলো।'

'না, আজ মনের অবস্থা ঠিক সে-রকম নেই।'

'কোয়াইট রাইট। ও কে বয়, ইফ আই ম্যানেজ মে জয়েন য়ু অ্যাট্ ললিতা'জ প্লেস।'

'বায় বায়।'

টেলিফোনটা ছেড়ে দিতেই হঠাৎ যেন আমার শিরদাঁড়ার কাছে একটা কাঁপুনি লাগলো। আর সেই কাঁপুনিটা শিরদাঁড়া বেয়ে ক্রমে

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করলো, আমি স্পষ্টই টের পেলাম আমার সারা শরীর জুড়ে একটা আক্ষেপের আলোড়ন ঢেউয়ের মতো উঠছে, আমি খামচে টেবিলটা ধরে মুখটা টেবিলে গুঁজে দিয়ে ঘষতে লাগলাম এবং একটা ব্যথা-বর্জিত, অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে শূন্যে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি কারোকে ডাকতে পারছি না, আমার এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে চিৎকার করে ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না এবং আমার পায়ের নিচে পুশ্‌বেলটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরেই আবার আমার শরীর স্থির হয়ে এল, আমি আমার রিভলভিং চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম আর কেবলই মনে হতে লাগল একটা ফর্ক দিয়ে নিজের গলায় বিদ্ধ করি, ঠিক যেমনভাবে রূপাকে কেউ বিদ্ধ করেছে।



বেশিক্ষণ আমি এভাবে থাকতে পারলাম না। একের পর এক কাজ শুরু হয়ে গেল। ফাইলের পর ফাইল আসতে লাগলো। স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশন দিতে হলো। বেলা দু'টোর পরে ক্যাশিয়ার এলেন। তাঁর হাত থেকে ছাড়া পেলাম সাড়ে তিনটেয়। তারপরে এল ইউনিয়নের সেক্রেটারি। পাঁচটা অবধি কোথা দিয়ে কেটে গেল। ঠিক এ সময়েই রমার ফোন এল। বললো, থানার লোক এসে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে গিয়েছে। বিশেষ করে গতকাল আমি যে-পোশাক পরেছিলাম সে-সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুধু দেখে নি নিয়েও গিয়েছে। আমি তখন ওকে ব্যাপারটা বললাম

এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। যেহেতু আমি গতকাল মহিলার (রূপার) বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই জন্যই পুলিস আমাকেও সন্দেহ না করে পারছে না এবং সেটাই স্বাভাবিক। এবং ওকে এ কথাও জানিয়ে রাখলাম, আমি অফিস থেকে বেরিয়ে পৃথ্বীশের বাড়ি যাবো, কোনো প্রয়োজন হলে রমা যেন আমাকে সেখানে টেলিফোন করে। তা ছাড়া আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।

সাড়ে পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে পৃথ্বীশের বাড়ি গেলাম। ললিতা আমার দিকে যেন কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো, তার সঙ্গে জিজ্ঞাসাও আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

ললিতা বললো, 'সে-কথা তো আমিই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। ব্যাপার কী? রূপা মার্ডার হয়েছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি জানলে কী করে?'

'পুলিস এসেছিল যে আমাদের বাড়িতে!'

'তোমাদের বাড়িতে? কেন?'

'তোমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে।'

এ সময়ে পৃথ্বীশও বেরিয়ে এল ভিতর ঘর থেকে, বললো, 'কী হে ওথেলো, ডেস্‌ডেমোনিয়াকে হত্যা করে বসে আছো?'

আমি সোফায় বসতে বসতে বললাম, 'তাই তো দেখছি। পুলিস তোমাদের কী জিজ্ঞেস করলো?'

ললিতা বললো, 'ও কিছু জানে না, ও বাড়িতে ছিল না। কথা হলো আমার সঙ্গেই। আমি বললাম, অধীপ মিত্র (আমি) যখন এসেছিলেন তখন আমার স্বামী ঘুমিয়েছিলেন, উনি আমার সঙ্গে দেখা করেই চলে গেলেন।'

আমি বললাম, 'ওরা তোমাকে কী জিজ্ঞেস করলো?'

ললিতা বললো, 'ওরা আসতেই তো আমি অবাক। একজন ডি ডি এসেছিলেন, আর একজন কে শাদা পোশাকের লোক, তাকে আমি চিনতে পারলাম না। চাকর এসে আমাকে বললো, একজন পুলিস অফিসার এসেছেন। কলিং বেল-এর শব্দ আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম। বাইরের ঘরে এলাম। ভদ্রলোক প্রথমে পৃথ্বীশের খোঁজ করলেন। বললাম, উনি বেরিয়েছেন, কী ব্যাপার বলুন তো ? তখন বললেন, ওঁরা তোমার সম্পর্কে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, গত-রাত্রে তুমি এসেছিলে কী না, এবং ক'টায়। আমি যা বলবার তাই বললাম। ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তখন কী রকম দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, খুবই শান্ত যদিও বেশ ড্রিংক করেছিল, আর তুমি বলেছিলে আমাকে মাফ করে দিও। সে কথাও বললাম। তারপরেই তুমি চলে গেলে। একটি কথাও না বলে। ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গায়ে কোনো রক্তের দাগ টাগ কিছু ছিল কী না। আমি বললাম, কিছুই না, কেবল ওকে উসকো-খুসকো দেখাচ্ছিলো। যেটা খুবই স্বাভাবিক। তখন আমি জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী ঘটেছে। ডি ডি রূপার খুনের ঘটনা বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী অধীপকে সন্দেহ করছেন নাকি ? ডি ডি হেসে বললেন, মিঃ মিত্র আপনাদের বন্ধু। কিন্তু ঘটনাটা এমনভাবেই ঘটেছে, উনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। কারণ হিসাবে তুমি তাঁদের কাছে যা বলেছ, সে কথা আমাকে বললেন, আর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তোমার এ রকম ব্ল্যাকআউট হয় কী না, তুমি ভুলে যাও কী না। আমি বললাম, অধীপের ব্যাপারে আমরা বেশ কয়েকবার এরকম দেখেছি, ও কিছুতেই সব কথা মনে করতে পারে না।'

বলতে বলতে ললিতা হাঁপিয়ে উঠলো। দম নেবার জন্য থামলো। পৃথ্বীশ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'শেষটায় বাস্তবিকেই তুমি লেডিকিলার হয়ে গেলে ?'

হেসে বললাম, 'তাই তো দেখছি।'

বলতে বলতে আমার যেন বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। আমার চোখে জল এসে পড়ার উপক্রম করলো। পৃথ্বীশ বলে উঠলো, 'আরে অধীপ, ডোণ্ট বি সো মাচ সেন্টিমেণ্টাল, আমি তোমাকে সে সব ভেবে কিছু বলি নি।'

বললাম, 'তা জানি। কিন্তু রূপার সেই ডেডবডি যদি তোমরা দেখতে যাকে আমি গতকাল রাত্রেই— ।'

ললিতা আমার সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো। এক্ষেত্রে ললিতার ঈর্ষা হবারই কথা। কিন্তু ও সমবেদনায় করুণ। বললো, 'আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অধীপ, উই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড য়ু।

আমি ললিতার হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে বললাম, 'তারপরে বলো, পুলিস আর কী জিজ্ঞেস করলো।'

ললিতা বললো, 'ডি ডি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মিত্রের এরকম ব্ল্যাকআউটের পিরিয়ড কতোক্ষণ থাকে। আমি বললাম, সেটা ঠিক বলতে পারবো না। কখনো কখনো দেখেছি পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে কী ঘটে গেছে ও কিছুই মনে করতে পারছে না, অথচ তার আগের এবং পরের সমস্ত ঘটনাই ওর মনে থেকেছে। আবার এমনও দেখা গেছে একটা সময়ের পর থেকে ও আর কিছুই মনে করতে পারে না, টোটাল ব্ল্যাকআউট যাকে বলে তাই হয়। তার জন্য অধীপ খুব কষ্ট পায়, অনেক সময় রেগে গিয়ে বলে, ড্রিংক ছেড়ে দেব। এই সব বলতে হয় তাই বললাম। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, রূপা চৌধুরীকে আমি চিনি কী না। বললাম, সাক্ষাৎ পরিচয় কখনো হয় নি, অধীপের মুখে শুনেছি। তারপরে ডি ডি আমাকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, বললেন, ড্রাংক অবস্থায় মিঃ মিত্র কখনো ফ্লেয়ার করেন কী? অ্যাঙ্গার যাকে বলে হঠাৎ রেগে গিয়ে একটা কিছু করে বসা? আমি বললাম, আজ পর্যন্ত

আমরা তো কখনো দেখি নি। তা ছাড়াও রাউডিজম্ বা ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, ও যতো ড্রিংক করে ততো সুইটার, দো হি বিকামস ওয়াইল্ড, নট ইন দ্য সেন্স অব ফ্লেয়ারিং; বাট য়ু ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড অফিসার হোয়াট আই মীন, হি ইজ এ নাইস চাম্। শুনে ডি ডি আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন, আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।'

পৃথ্বীশ বলে উঠলো, 'তার মানে ডি ডি বুঝেছেন তুমি অধীপ মিত্রের একজন অনুরাগিণী বান্ধবী।'

ললিতা বললো, 'খুবই স্বাভাবিক। তারপরেই ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মিত্র কি এর মধ্যে আপনাদের টেলিফোন করেছিলেন? আমরা এখানে আসবার আগে? বললাম, না, কোনো টেলিফোনই সে করে নি। আমি সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজেই ওকে একবার বাড়িতে টেলিফোন করেছিলাম। ডি ডি বললেন, সে কথা মিঃ মিত্র আমাদের বলেছেন এবং চিকেন রোল্ কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন, সে কথাও বলেছেন। তারপরে ভদ্রলোক যাবার আগে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, আর বললেন, মিঃ মিত্র এমন চার্মিং জেন্টলম্যান তাঁকে দিয়ে আমরা কিছু ভাবতেই পারছি না। ওঁর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোনো খারাপ রেকর্ড নেই, একসেপ্ট হি ইজ এ ম্যান অব্ উওমেন'স ওয়ার্ল্ড। আমি মনে মনে হাসলাম, মনে মনে বললাম, ওটা অধীপ মিত্রের দোষ না মেয়েদের কপাল।'

বলে ললিতা হেসে উঠলো। পৃথ্বীশ বললো, 'তা এসব ডিটেকটিভ মার্কা গপ্পোই হবে, নাকি আর কিছু হবে। অধীপ মিত্র মহাশয় কি আজ থেকে ড্রাই লাইফে চলে গেলেন?'

বললাম, 'মোটেই না। দাও, বের করো কী আছে। তবে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো, রমাকে টেলিফোনে জানিয়েছি। ও খুব দুশ্চিন্তায় আছে, কারণ পুলিস আমার বাড়িতে গেছলো, আমার

গতকালের পোশাক ট্রাউজার শার্ট টাই সবই ফরেনসিক টেস্টের জন্য নিয়ে গেছে।'

ললিতা অবাক হয়ে বললো, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। লোকাল থানার ও সি বেশ হোস্টাইল মনে হলো। হবে হয়তো ভদ্রলোক মনে মনে চাইছেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে একদিন আলাপ পরিচয় করবো, সে সব করি নি। তিনি তো আমার মুখের ওপরেই আমাকে চরিত্রহীন বললেন, অবিশ্যি ডি ডি আমার সামনেই তাঁকে ধমকে দিয়েছেন।'

ললিতা বললো, 'বসো আমি এদিকে একটু অ্যারেঞ্জ করি।'

ও ভিতরে চলে গেল। আমার এই বন্ধু পৃথ্বীশ একদিক থেকে বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছে। ও যথেষ্ট বড়লোক। কলকাতায় খানকয়েক বাড়ি আছে। বড়বাজারে পৈতৃক ব্যবসা আছে, যেখানে ও সারাদিনে ঘণ্টা কয়েক কাটায়। একটিমাত্র মেয়ে বছর দশ বয়স সে দার্জিলিং-এ থেকে পড়াশোনা করে। একটা গোটা বাড়িতে ওরা দু'জন আর চাকর-বাকর ছাড়া কেউ নেই। ওর ধারণা নিজে যে বাড়িতে থাকবে সেখানে কোনো ভাড়াটে রাখা চলে না। একদিক থেকে যেমন ঠিক তেমনি বাড়িটাকে ভূতুড়ে বলে মনে হয়। আট দশটা ঘরওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি, বাস করে একমাত্র স্বামী-স্ত্রী, কেমন যেন ফাঁকা লাগে।

ললিতা এল। পিছনে চাকরের হাতে ট্রে, ট্রে-র ওপর হুইস্কির বোতল গেলাস আর সোডার বোতল রয়েছে। প্লেটে কিছু কাজু নাটস্। বললো, 'অধীপ, তুমি তো অফিস থেকে সোজা এসেছ, একটু মাছভাজা গরম করে আনতে বলেছি।'

আমি বললাম, 'তার কী দরকার ছিল।'

অবিশ্যি বলতে ভুলে গিয়েছি, অফিসে আমাকে লাঞ্চ দেওয়া হয়েছিল। আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম আমাকে যেন খালি একটু

স্যুপ আর টোস্ট দেওয়া হয় উইদাউট বাটার। ললিতা বললো, 'অফিসে আজ কী লাঞ্চ করেছ সে তো তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

পৃথ্বীশ ইতিমধ্যে তিনটি গ্লাসে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে প্রস্তুত। বললো, 'নাও আগে একটু চুমুক দাও।'

ললিতা আমার দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিল। আমি ডান হাত বাড়িয়ে গ্লাস ধরতে যেতেই গ্লাস পড়ে যাবার উপক্রম করছিল। বুড়ো আঙুলটার কথা এখন আমার মনে পড়ে গেল আর গ্লাস ধরবার জন্য মুড়তে গিয়ে ব্যথা অনুভব করলাম। ললিতা বললো, 'কী হলো?'

আমি আঙুলটা ওদের সামনে তুলে ধরে দেখালাম। এখনো প্রায় এক রকমই রয়েছে। ফোলা লাল নীল শিটা দাগ। আজ আমি একটাও সই করতে পারি নি, সবই আমার অ্যাসিস্টান্টকে করতে হয়েছে। ললিতা আমার আঙুলটা আলতো করে ধরে বললো, 'কী করে এরকম লাগালে বলো তো? দেখে তো মনে হচ্ছে, কোথাও চেপটে গেছলো।'

আমি বাঁ হাতে গ্লাস তুলে নিয়ে বললাম, 'কিছুই মনে করতে পারছি না। কাল রাত্রে তো কোনো পেইন ফীল করি নি। আজ সকালে চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে টের পেলাম। ভেবেছিলাম, ডাক্তারকে একবার দেখাবো। সে কথা আর মনেই নেই।'

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু লাগিয়েছো?'

'কিছুই না।'

পৃথ্বীশ বললো, 'আমাদের ডাক্তারকে একবার ডাকবো নাকি?'

আমি বললাম, 'থাক না কী দরকার। এমনিই সেরে যাবে। ফ্রাকচার হলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হতো। তা যখন করছে না তখন মনে হয় সেরকম কিছু হয় নি।'

ললিতা ওর স্বামীকে বললো, 'না না, তুমি একবার ডাক্তারকে

টেলিফোনে ডাকো, উনি যেন চেম্বার সামলে একবার ঘুরে যান। একবার দেখা দরকার।'

পৃথ্বীশ হাতে গ্লাস তুলে বললো, 'তার আগে চিয়ার্সটা করে যাই।'

আমরা তিনজনেই গ্লাস তুলে চুমুক দিলাম। ললিতা বললো, 'অধীপের মিথ্যা কলঙ্ক মোচনের আশায়।'

পৃথ্বীশ চলে গেল। আর হুইস্কির পাত্রে চুমুক দিয়েই আমার গতকালের কথা মনে পড়ে গেল। গতকালের হুইস্কির স্বাদ ছিল আলাদা, একটা তীব্র সুখের জ্বালার মতো। আর এখন যেন বিষের জ্বালার মতো মনে হলো। যেন আত্মহননের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার মতোই মনে হলো, আমি বিষ পান করবো। ভাবতে ভাবতেই আমি সুদীর্ঘ চুমুকে গ্লাসের প্রায় অর্ধেক শূন্য করে দিলাম। ললিতা হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললো, 'একি করছো অধীপ, ডোণ্ট বী সেণ্টিমেণ্টাল। ওরকম করে খাচ্ছো কেন।'

বলে ও আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলে। আমি বললাম, 'জানো ললিতা, আজ আমার বিষ পানের ইচ্ছা হচ্ছে। আই অ্যাম নট রিয়্যালি সেণ্টিমেণ্টাল বাট দেয়ার ইজ সামথিং ইনসাইড মী যা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না। সামথিং ভেরি পেইনফুল, টেরিবল টরমেণ্টিং। আমার মাথা কুটতে ইচ্ছা করছে কেন আমি কিছু মনে করতে পারছি না। আমি যদি রূপাকে ঠিক মতো রেখে আসতে পারতাম তাহলে এ দুর্ঘটনা কখনোই ঘটতো না। একটা জীবন এভাবে নষ্ট হয়ে গেল।

ললিতা আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'এ জন্য এখন আর ভেবে কী হবে অধীপ। তুমি ভালোই জানো তোমার কিছুই করবার নেই। আমার মনে হয় রূপা ড্রাংক অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, তুমি কখন দরজা খুলে বেরিয়ে চলে এসেছ সেই ফাঁকে কেউ এ কাণ্ড করেছে।'

'কিন্তু কেন, কেন করবে? রূপার টাকা-পয়সা কিছু খোয়া যায় নি। যদি ধরে নিই কেউ ওকে রেপ্ করতে চেয়েছিল তার জন্য ওভাবে মার্ডার করার কী দরকার ছিল?'

ললিতা বললো, 'তা তুমি বলতে পারো না। পৃথিবীতে সেডিস্টরা যে কী করতে পারে আর না পারে, তা কেউ বলতে পারে না। দে ক্যান গো টু এনি এক্সট্রিম্! একটি মেয়েকে তারা টুকরো টুকরো করে কাটতে পারে, ব্রেস্ট কেটে ফেলতে পারে ইভন দ্য—

আমি আর শুনতে পারলাম না, বলে উঠলাম, 'প্লিজ স্টপ ললিতা ডোণ্ট স্পে।'

ললিতা চুপ করে গেল। পৃথ্বীশ ঢুকলো, বললো, 'ডাক্তার বললো, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছে।'

আমি হাতের ঘড়ি দেখলাম, প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। তার মানে ডাক্তারের আসতে প্রায় সাড়ে সাতটা। কিন্তু আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো। আটটা সাড়ে আটটার বেশি দেরি করতে চাই না।

এ সময়েই ললিতার চাকর ফিশ ফ্রাইয়ের প্লেট নিয়ে এল। বেশ গরম, ধোঁয়া উঠছে এখনো। আমি সিগারেট ঠোঁটে চেপে ডান হাত দিয়ে লাইটার জ্বালাতে গিয়ে আবার ভুল করলাম, ব্যথা করে উঠলো বুড়ো আঙুলে। ললিতা আমার হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করলো, 'অফিসের কাজকর্ম করলে কী করে আজ?'

বললাম, 'হাতে কিছুই করি নি মানে লেখা বা সই করি নি, দেখেছি আর বলেছি।'

ললিতা একটা ঝকঝকে ফর্ক আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও মাছভাজা খাও।'

আমি হাতটা বাড়াতে গিয়েও যেন আতঙ্কে থমকে গেলাম।

স্থির আতঙ্কিত চোখে ফর্কটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর আমার শিরদাঁড়ার কাছে আবার সেইরকম একটা কাঁপুনি লাগলো যেটা ক্রমেই শিরদাঁড়া বেয়ে মস্তিষ্কের দিকে উঠতে লাগলো। মনে হলো, ফর্কটা টেনে আমি আমার গলায় বিঁধিয়ে দেব, ঠিক যেমন করে রূপার গলায় বেঁধানো হয়েছিল। ললিতা প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'অধীপ, অধীপ, কী হয়েছে ?'

পৃথ্বীশ তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'এই অধীপ, কী হয়েছে এতো ভয় পাচ্ছো কেন ?'

আমি ললিতার হাতের ঝকঝকে যেন উদ্যত থাবার মতো ফর্কের নখগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে স্খলিত গলায় বলতে পারলাম, 'ডাক্তার বলেছে এরকম একটা ফর্ক দিয়েই নাকি রূপাকে গলায় বিঁধিয়ে মারা হয়েছে।'

শোনামাত্র ললিতা আমার চোখের সামনে থেকে ফর্কটা সরিয়ে নিল। আরো যে-দুটো ফর্ক ছিল, সেগুলো নিয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো কয়েক সেকেণ্ডর মধ্যেই, হাতে চামচ নিয়ে। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। তখনো পৃথ্বীশ আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আমি যেন আস্তে আস্তে আবার নিজেকে ফিরে পেলাম। মুখ ঢেকে রাখা অবস্থাতেই বললাম, 'সরি, আয়াম সরি।'

বলে মুখ থেকে হাত সরালাম। পৃথ্বীশ আমাকে ছেড়ে ওর জায়গায় গিয়ে বসলো। ললিতা আমার পাশে যেমন বসেছিল তেমনি বসলো। নিচু উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কেমন বোধ করছো অধীপ। চোখে মুখে একটু জল দেবে কী ?'

আমি বললাম, 'না না, তার কোনো দরকার হবে না। আসলে রূপার ডেডবডিটা আমার দেখা উচিত হয় নি। কণ্ঠার ঠিক ওপরেই

'ওর সেই গলায় ফর্ক ঢোকানো গর্তটা আর শুকনো রক্তর কথা আমার মনে পড়ে গেল, তাইতেই— ।'

আমি কথাটা অসমাপ্ত রেখে আমার হুইস্কির গ্লাস তুলে নিলাম। পৃথ্বীশ আর ললিতাও নিল। ললিতা বললো, 'আমার একটুও ভাল লাগছে না। তুমি অধীপ, আমাদের সকলের আনন্দ আর খুশির মধ্যমণি, তোমার চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। এসব চিন্তা তুমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যালো তো, একটু অন্য কথাবার্তা বলো। নাও, মাছ খাও। তুমি তো ডান হাত দিয়ে ভেঙে খেতে পারবে না আমিই মুখে তুলে দিচ্ছি।'

বলে এক টুকরো ফ্রাই ভেঙে আমার মুখে তুলে দিল। আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে পৃথ্বীশের দিকে তাকালাম। পৃথ্বীশ বললো, 'ইয়া, য়ু শুড গিভ রিটার্ন।'

আমি ললিতার গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে দিলাম। তারপরে মাছ চিবিয়ে খেতে লাগলাম। মাছ গিলে নিয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলাম। ললিতাও হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'চলো আজ আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি। ডায়মণ্ডহারবার বা কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসা যাক। না হয় তো ফিল্ম শো'তেও যাওয়া যায়।'

আমি বললাম, 'রমাকে বলেছি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো।'

পৃথ্বীশ বললো, 'রমাকেও সঙ্গে নিয়ে বেরনো যাক।'

বললাম, 'তা বোধহয় ও বেরোতে চাইবে না। থাক, এখানেই বসি।'

বলে আমি আমার পাত্র শূন্য করে পৃথ্বীশের দিকে এগিয়ে দিলাম। পৃথ্বীশ বললো, 'ডোণ্ট গো মাচ ফাস্ট।'

হেসে বললাম, 'একটু ফাস্ট নেওয়াই ভালো। মেজাজটা যাতে হালকা হয়।'

পৃথ্বীশ আমাকে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে দিল। ললিতা হেসে

বললো, 'সে-রকম বোঝ তো অন্য কোনো বান্ধবীর কাছে যাবে নাকি?'

বললাম, 'তোমার যদি ভালো না লাগে, তা হলে যেতে পারি।'

ললিতা আমার শার্টের কলারের ওপরে গলায় আস্তে করে একটা চিমটি কাটলো। বললো, 'য়ু শ্যুড বী অ্যাসেম্‌ড। তোমার্‌ সেই বান্ধবীটির খবর কী, ছাত্রীটি?'

বললাম, 'আছে। কিন্তু তার কাছে যাবার কোনো আর্জ ফীল করছি না। ওটা একটা অন্য মুডের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রেম করার মতো। সামটাইম্‌ সত্যি খুব রোমান্টিক।'

'ফীলিং জেলাস?'

'জেলাস হলে যদি তুমি তাকে ছেড়ে দিতে, তা হলে জেলাস হতাম। আদার ওয়াইজ লাভ কী?'

ললিতা আমার মুখে ফ্রাইয়ের টুকরো তুলে দিতে দিতে বললো। আমি মাছ চিবোতে চিবোতে বললাম, 'সরি।'

ললিতা বললো, 'বাচ্চাগুলোকে এবার ছাড়ো না। আমাদের মেয়েরাও যে বড় হচ্ছে। তুমি কী শেষটায়—'

আমি হোহো করে হেসে উঠলাম। ললিতা বললো, 'না না, তোমার ব্যাপার মোটেই সুবিধার না। এর পরে দেখছি তুমি কেলেঙ্কারি করবে।'

পৃথ্বীশ ঠাট্টা করে বললো, 'ওর কী দোষ বলো। মাতা নহমাতারা এক সঙ্গে যদি ওকে নিয়ে টানাটানি করে, ও কী করবে?'

আমি বললাম, 'এটা কোনো আলোচনার বিষয় হতে পারে না।'

ললিতা বললো, 'তুমি পারো আর আমরা আলোচনা করতে পারি না, না? এবার একটু শান্ত হও না।'

আমি ম্লান হেসে বললাম, 'সত্যি আমি একটা ফিলাণ্ডারার কী না

জানি না, তাই সামটাইমস্ আই হেট মাইসেলফ্। দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি সামথিং রঙ্ ইনসাইড মী! তবে একথাও ঠিক, আমি কারোর ক্ষতি করতে চাই না। নিজেকেও আমি একটা হাইপার সেকসুয়াল বলে মনে করি না। যে সমাজে আমি বাস করি, তার মধ্যে আমি এ প্যাটার্ন অব্ লাইফ বেছে নিয়েছি। তার মধ্যে নিরঙ্কুশ সুখ নেই, বরং একটা অসুখী বিক্ষোভ বোধহয় কোথাও জমা হয়ে থাকে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য, একটু পান, প্রেম-প্রেম খেলা ইত্যাদি নিয়ে কাটিয়ে দিতে চাই। পণ্ডিত লোক নই যে, কোনো ব্যাপক চিন্তার জগতে ডুবে থাকবো। আমি একটা চাকুরে মানুষ, সেখানে বহুবিধ অন্যায় অবিচার চোখের সামনেই ঘটছে। আমার নিজের হাত দিয়েও ঘটছে, অথচ তার বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতাও আমার নেই।'

বলতে বলতে আমি হঠাৎ থেমে গিয়ে গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'লেকচার শুরু করে দিয়েছি। মানে হুইস্কির এফেক্ট শুরু হয়ে গেছে!'

ললিতা বললো, 'মোটেই না। তুমি বেশ ভালো মুডেই কথা বলছো? তোমার ন্যাচারেল মুডে। তুমি বলো না কী বলছিলে?'

বললাম, 'কী আর, এ সবই। যেমন ধরো, আমি বেশ খেয়ে পরে বেশ ভালোই আছি, অথচ একবারের জন্যও যখন আমার মনে পড়ে যায় সম্পদের সামান্য অংশও বেশির ভাগ মানুষ ভোগ করতে পায় না, তখন সমস্ত জীবনটাকেই কেমন একরকম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই অবাস্তব। অথচ আমি কিছুই করতে পারি না, আমার মধ্যে কোথাও আত্মবিদ্রোহ নেই। তার চেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক জীবনটা। এবং সত্যি বলতে কি আমার জীবনটাকেও অনেকে খুব খারাপ চোখে দেখতে পারে, পারুক, আমি বলবো, মেয়েদের সান্নিধ্য আমার ভালোই লাগে, অবিশ্যিই যারা একটু দয়াবতী এবং রসিকা।'

বলে ললিতার দিকে তাকিয়ে আমি হেসে উঠলাম। ও আমার মুখে ফ্রাই গুঁজে দিয়ে বললো, 'সেটা অন্যায় কিছু না।'

আমি পৃথ্বীশের দিকে তাকালাম। ও ঘাড় দুলিয়ে বললো, 'বুঝি না ভাই। ব্যবসা-ট্যাবসা নিয়ে থাকি, তা নিয়েই কেটে যাচ্ছে। তবে মহিলারা স্ব-মুখেই যখন বলছেন, অন্যায় কিছু না আমি আর কী বলতে পারি? তোমার নিজেরো তো ভালোই লাগে।'

বললাম, 'সে কথা তো একশোবার স্বীকার করছি। অবিশ্যি আমি মেয়ে বলতে একটা ব্যাপারই বুঝি না। আই রেসপেক্ট দেম, আই রিগার্ড, তাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কেও আমি মোটেই নির্বিকার থাকবার লোক নই। তবে হ্যাঁ, ভালবাসা ব্যাপারটা তো কোনোদিনই বুঝতে পারি নি, ওটা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বোঝবার জন্যই থাক। আমি কারোকে আহত না করে, সমাজকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না করে, একটু হেসে খেলে যাতে কাটিয়ে যেতে পারি তারই চেষ্টায় আছি। আর আমি এটাও মনে করি, জগৎ সংসারে মেয়েরা প্রাণস্বরূপ। আমাদের জীবনে তাদের ভূমিকার অন্ত নেই। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা যখন সে শক্তিরূপিণী, আনন্দদায়িনী হলাদিনী শক্তি। আমি সেই রূপেই তাদের ভজন-পূজন করতে চাই।'

কথা থামিয়ে আমি আবার গেলাসে চুমুক দিলাম। ললিতা আমার মুখে ফ্রাই গুঁজে দিল। আমি হেসে বললাম, 'তা ছাড়া আমার এক বন্ধুর বিদেশিনী পত্নীর সেই মজার কথাটা কখনো ভুলতে পারি না।'

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী?'

বললাম, 'তোমাদের বলি নি বুঝি? এই তো বছর খানেক আগেকার কথা, আমরা একটা ক্লাবের লনে প্রায় বারো তেরোজন বন্ধু গোল হয়ে বসে ড্রিংকের সঙ্গে গল্প-গুজব করছি। বন্ধুটি এল সস্ত্রীক।

আমরা সবাই বন্ধুপত্নীকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালাম। বন্ধুপত্নী যেন কেমন গম্ভীর হয়ে রইলেন। বসলেন, কথাবার্তাও বললেন, কিঞ্চিৎ পানও করলেন। পরে শুনলাম, সে তার স্বামীকে বলেছে, তোমার বন্ধুরা কি হোমোসেকস্যুয়াল নাকি? সন্ধ্যেবেলা ডজনখানেক যুবা-পুরুষ একসঙ্গে বসে ড্রিংক করছে, মনে হলো ওটা সমকামীদের একটা আড্ডা।'

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বলে উঠলো, 'যাহ্, অধীপ এটা তুমি বানিয়ে বলছো।'

আমি বললাম, 'অন গড বলছি, বানিয়ে বলে আমার কী লাভ। ব্যাপারটা তোমরা ভেবে ছাখো, বন্ধুপত্নী যে দেশের মেয়ে, সে হয়তো ভাবতেই পারে না সন্ধ্যেবেলা একদল পুরুষ একসঙ্গে বসে পান করছে, গল্প করছে। একটিও মেয়ে নেই। আমি নিশ্চয়ই সে দেশের মানুষ নই, কিন্তু কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমাদের দেশের রেওয়াজ অবিশ্যি তাই, আমাদের সমাজ সামাজিকতাও ভিন্ন, বন্ধুপত্নী যা বলেছিল সেটাও তার দিক থেকে সে কিন্তু অন্যায় বলে নি। আমিও মনে করি, চাইও তাই, যে নিছক পুরুষদের থেকে মেয়েদের সঙ্গে অড্ডা দেওয়া অনেক ভালো। আর শুনেছি, গুরুদেব লোকেরা নাকি তাই করে থাকেন, যদিও বাইরে থেকে তাদের দেখা বা চেনা যায় না।'

বলে আমি হাসলাম। গেলাসে চুমুক দিলাম। ললিতা আমার মুখে ফ্রাই দিল। পৃথ্বীশ বললো, 'গুরুদেব তো আমাদের সামনেই বসে আছেন।'

আমি বললাম, 'তা যা-ই বলো ভাই, ব্যাপারটাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা অনেকখানি, তবু বলবো, আমি নারীসঙ্গ চাই। এই যে ললিতা এখন আমাকে মাছভাজা খাইয়ে দিচ্ছে, ডাক্তার ডেকে আনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো, এটা নারী হিসাবে কেবল যে

বন্ধুকৃত্য করলো তা-ই না, এটা তো একদিকে মায়েরও কর্তব্য।'

ললিতা আমার কাঁধে একটু চাপড় মেরে বললো, 'আমি তোমার এ কমপ্লিমেণ্ট আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। আমি অনেক সময় মা হিসাবেই তোমাদের দেখে থাকি।'

এ সময়েই ডাক্তার এলেন। এ পরিবারের ইনি ডাক্তার, ডক্টর ঘোষ। আমার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। ললিতা ডাকলো, 'আসুন ডক্টর ঘোষ।'

ডক্টর ঘোষ লোকটি, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথাজোড়া টাক, গোলগাল মানুষ এবং বেশ হাসিখুশি। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কী, শুনলাম কোথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে গিয়ে বুড়ো আঙুলে চোট লাগিয়েছেন?'

আমি বেশ বুঝতে পারছি হুইস্কি পেটে পড়তে শুরু করার পরে আমি কথা যেমন বেশি বলতে আরম্ভ করেছি, আমি আমার ফর্মকেও ফিরে পেতে আরম্ভ করেছি। আঙুলের ব্যথাটা এখন যেন তেমন অনুভবই করছি না। বললাম, 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ কী না জানি না, তবে চোট একটা লেগেছে কোনোরকমে, কিন্তু কোথায় কী ভাবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ললিতা আমার পাশ থেকে উঠে বললো, 'ডক্টর ঘোষ, আপনি এখানে বসুন? আপনার জন্য একটা গ্লাস আনি?'

ডক্টর ঘোষ হেসে বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ মিসেস চক্রবর্তী, কিন্তু আমার এখনও কয়েকটা কল বাকি আছে। সেসব না সেরে ড্রিংক-টেবিলে বসতে পারবো না। কই দেখি মিঃ মিত্র, আঙুলটা দেখি।'

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলাম। ডক্টর ঘোষ আমার হাতটা টেনে ধরে বুড়ো আঙুলটা দেখলেন। হাত দিয়ে একটু জোরে টিপতেই আমার লাগলো। উনি তেমন গ্রাহ্য করলেন না। প্রায়

জোর করেই, আঙুলটা সামনের দিকে বাঁকাতে চেষ্টা করলেন, আমার আরো বেশি লাগলো। ডাক্তার তবুও গ্রাহ্য না করে, আঙুলটা পেছনে হেলাবার চেষ্টা করলেন। তারপরে নীল শিটা পড়া দাগের পর আঙুল বুলিয়ে, নখ দিয়ে একটু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখলেন, বললেন, 'হুম্, এমন কিছু ব্যাপার না, ফ্রাকচার হয় নি। আঙুলটার দু'পাশ থেকে চেপ্‌টে গিয়েছিল, সেইজন্য এখানে রক্ত জমে গেছে। যখন লেগেছিল, তখনই একটু বরফ ঘষে দিলে এতোটা ফুলতো না, ব্যথাও কমে যেতো।'

ললিতা বললো, 'বরফ লাগাবে কে। ও তো জানেই না, কখন কোথায় কি ভাবে লেগেছে।'

ডাক্তার বললেন, 'যেখানেই লেগে থাকুক, সেখানে শুধু মেটাল ছিল না, কোনোরকমের হার্ড রাবার বা ওই জাতীয় কোনো লাইনিং প্যাড ছিল, তা না হলে কেটে গিয়ে রক্ত পড়তো। গাড়ির দরজায় লাগতে পারে। না হয় মনে করে দেখুন, ফ্রিজ বন্ধ করতে গিয়ে নিজের আঙুলসুদ্ধ দরজা চেপে দিয়েছিলেন কী না। কিংবা কোনো ফোল্ডিং সোফার ভাঁজে, আঙুলটা চাপা পড়ে গেছলো কী না।'

অন্ধকার, গভীরতর, নিশ্ছিদ্র, কিছু মনে করতে পারছি না। ললিতা আর পৃথ্বীশ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ডাক্তার বলে উঠলেন, 'যাহোক মারাত্মক কিছুই হয় নি, হাড়ে লাগে নি। দু'একটা দিন একটু ভোগাবে। আমি একটা মালিশ লিখে দিচ্ছি, ওটা লাগান। একটা ট্যাবলেটও লিখে দিচ্ছি, খুব বেশি ব্যথা করলে, সেটা খাবেন।'

ললিতা তাড়াতাড়ি একটা রাইটিংপ্যাড নিয়ে এসে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিল। ডাক্তার ওষুধের নাম লিখলেন। আমি বললাম, 'এমনিতে আমার কোনো পেইন নেই। তবে কিছু ধরতে গেলে আঙুলে লাগছে

ডাক্তার বললেন, 'কিছু না, ঝোঁকের মাথায় কোথায় কখন লাগিয়ে বসে আছেন, সামনের দিকে ফেটে গিয়ে রক্তপাত হতে পারতো, অ... নি, জমে গেছে।'

ডাক্তার রাইটিংপ্যাডটা ললিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আর একটু পেটে পড়লে, ব্যথা ...র থাকবেই না হয় তো, তবে আর চোট লাগাবার চেষ্টা করবেন না।'

ললিতা হেসে উঠলো। পৃথ্বীশ পকেট থেকে বত্রিশটা টাকা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ডাক্তার ঘোষ বলে উঠলেন, 'থ্যাংকু মিঃ চক্রবর্তী, ওটা এখন পকেটে রাখুন। মিঃ মিত্রের কাছে আমাকে শীগগিরই ছুটতে হবে. নার্সিংহোমটায় হাত দিয়েছি তো, মিনিমাম তিন লাখ টাকার দরকার হবে।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমিও পকেট থেকে পার্স বের করেছি। বললাম, 'সে আপনি দশ লাখ টাকার জন্য আসুন না, আমার ঘর থেকে তো দেবো না। কিন্তু ভিজিট নেবেন না কেন।'

ডাক্তার ঘোষ তখন দরজার কাছে চলে গিয়েছেন, বললেন, 'তখন অনেক ভিজিট আমাকেই দিতে হবে কী না, সেটা একটু কমিয়ে রাখলাম।'

বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। ললিতা বললো, 'ছেড়ে দাও, ডাক্তার আমাদের কাছ থেকে অনেক টাকা আজ পর্যন্ত পেয়েছে, আজ বত্রিশটা টাকা না নিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

আমি হেসে বললাম, 'এয়ারে কয় মাইয়ামানুষ।'

ললিতা বললো, 'অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, একে বলে স্ত্রীলোক। তোমাদের মতো অতো ভদ্রতা আমার নেই। ডক্টর ঘোষের টাকার অভাব কী। আমাদের সঙ্গে কি কেবল ওঁর টাকার সম্পর্ক?'

বলে ললিতা চাকরকে ডেকে বললো, 'এ ওষুধগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। ওই ড্রয়ারে টাকা আছে, দশটা টাকা নিয়ে যাও, মনে হয় ওতেই হয়ে যাবে।'

আমি জানি, ললিতাকে ওষুধের টাকা দিতে যাওয়া বৃথা, ও আমার কথা শুনবে না। পৃথ্বীশ বললো, 'আসলে ডক্টর ঘোষ তো বলেই গেলেন তাঁর নিজের কথা। নেহাত অধীপের ব্যাপার বলেই টাকাটা নিল না, আমাদের কারোর ব্যাপার হলে, ঠিক টাকা নিয়ে ভেগে পড়তো! এসব ব্যাপারে ডাক্তাররা বড় শক্ত মানুষ।'

আমি গেলাস শূন্য করে, আবার পৃথ্বীশের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার মন মেজাজ এখন বেশ হাল্‌কা বোধ করছি। দূর আকাশে মেঘ করলে, সেখান থেকে বিদ্যুৎ চমকের ঝিলিক যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনিভাবে রূপার মুখটা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাকে তা গভীরভাবে বিচলিত করতে পারছিল না। আমি যেন ক্রমেই অন্য মানুষ হয়ে উঠছি। খানিকটা খুশি আর আনন্দে বিহ্বল।

এ সময়ে চাকর মালিশের ওষুধ আর ট্যাবলেট নিয়ে ফিরলো। ললিতা মালিশের শিশি খুলে, শাদা রঙের পাতলা মালিশ আমার আঙুলে লাগিয়ে দিল।

পৃথ্বীশ আমার দিকে গ্লাস পূর্ণ করে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'দেন বয় য়ু আর গেটিং য়োরসেলফ?'

আমি গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালো লাগছে।'

মাছের ফ্রাই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ললিতা নিজেই খালি প্লেটটা ভিতরে রেখে আমার পাশে এসে বসলো। বললো, 'থাক তোমার যে ভালো লাগছে এটাই ভালো। কিন্তু মাইণ্ড, দিস ইজ য়োর লাস্ট ড্রিংক। তুমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বলেছ।'

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, 'নিশ্চয়ই। আটটা বাজছে। সাড়ে আটটায় আমি বাড়ি পৌঁছুবো।'

এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠলো। পৃথ্বীশ উঠে গেল পাশের ঘরে টেলিফোন ধরতে। আমি ললিতার দিকে তাকালাম। ললিতা বললো, 'চোখে তো ঘোর লেগেছে দেখছি।'

'তোমাকে দেখলেই লাগে।'

'কিন্তু রূপার সামনে থাকলে নিশ্চয়ই লাগতো না।'

আমি চমকে উঠলাম। বলে উঠলাম, 'কে রূপা?'

বলতে না বলতেই, রূপার সেই নগ্ন নিহত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেসে ওঠা মাত্রই, আমার কোমরের নিচে, ঠিক মাঝখানের গ্রন্থির কেন্দ্রে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো অনুভূত হলো। আর বিদ্যুৎ কষায়, একটা কাঁপুনি আমার শিরদাড়ায় লাগলো। সেই কাঁপুনি ক্রমে ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করলো। আমি মোটেই এ ব্যাপারে আর অচেতন নেই, আজ দুপুরেই একবার অফিসের ঘরে এ ঘটনা ঘটেছিল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে, এই সাপ বেয়ে ওঠা কাঁপুনিটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা এমনই তীব্র এবং অনিবার্য, তার গন্তব্যের যাত্রা আমার মস্তিষ্কের দিকে একই ভাবে এগিয়ে চললো, আর আমার শরীর জুড়ে যেন একটা আক্ষেপ শুরু হলো, এবং আমি দু' হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চাইলাম, কেন না আমার মনে হলো আমি যেন গভীর শূন্য থেকে অসহায়ভাবে পড়ে যাচ্ছি, যে কারণে মুখটা কোথাও গুঁজে দিতে ইচ্ছা করলো।

আমার বাড়ানো হাত ললিতা নিজের হাতে ধরে ফেললো, আমার মুখ ওর কাঁধের কাছে গুঁজে দিলাম। কিন্তু ললিতা যে আমাকে ধরছে বা ওরই কাঁধে আমি মুখ গুঁজে দিয়েছি, এ ব্যাপারেও আমি যেন তেমন সচেতন নই। আমি যেন বহুদূর থেকে ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি, অধীপ-অধীপ—অধীপ···। আর সেই ডাকে সাড়া দেবার জন্য চেষ্টা করেও, আমার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের করতে

পারছি না, এবং আমি পা দিয়ে জোরে জোরে মেঝে আঁকড়ে ধরতে চাইছি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই, আমি আমার কানের কাছে আমার নাম শুনে হঠাৎ বলে উঠলাম, 'অ্যাঁ, কী?' বলেই ললিতার কাঁধ থেকে আমি মুখ তুললাম। আমার শরীরের আক্ষেপ স্তব্ধ। আমি নিজেকে ফিরে পেলাম, এবং যেন ঠিক মনেই করতে পারছি না, মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল। দেখলাম ললিতা আমার দিকে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে, এবং পাশের ঘরে তখনো পৃথ্বীশের গলা শুনতে পাচ্ছি, সে টেলিফোনে কারোর সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছে।

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে অধীপ?'

আমি খানিকটা অসহায়ভাবে বললাম, 'কি যেন একটা হয়ে গেল, তাই না?'

আমার পাল্টা জিজ্ঞাসা শুনে, ললিতা যেন আরো অবাক হলো। বললো, 'তুমি জানো না, তোমার কী হয়েছিল?'

আমি বললাম, 'না, ঠিক বুঝতে পারলাম না, মনে হলো, শিরদাঁড়ার কাছ থেকে কাঁপতে কাঁপতে কি একটা যেন আমার ব্রেনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, তা ছাড়া আর কিছু তো ফীল করতে পারি নি।'

ললিতা ওর শাড়ির আঁচল তুলে, আমার ঠোঁটের কষ মুছিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?'

ললিতা বললো, 'তোমার মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে।'

আমার মনটা ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে গেল। এবং একটা ভয়ও যেন পেলাম। আমার কি হিস্টিরিয়া জাতীয় কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে নাকি? আমি তো বেশ ভালোই ছিলাম। আমার থার্ড পেগ চলছিল এবং আমি বেশ স্পষ্টই মনে করতে পারছি, পৃথ্বীশ টেলিফোন ধরতে যাবার পরেই আমি ললিতার দিকে তাকিয়েছিলাম। ওকে একটা চুমো খাবো বলে। একটা নতুন কোনো

ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল মনে করবারও কোনো কারণ নেই। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং মাত্রাধিক্য পরিমাণ পান হয়ে গেলে পৃথ্বীশ যে কোনো বাধা নয়, সেকথাও আগে বলেছি। পৃথ্বীশের সামনেও সেরকম ঘটনা ঘটেছে। তথাপি যেন কি ঘটে গেল, আমিও বুঝতে পারলাম না। ললিতা এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর চোখে গভীর জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল।

আমি গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'আমার কি হিস্টিরিয়া গ্রো করছে নাকি বুঝতে পারছি না।'

ললিতা বললো, 'না, মূর্ছা না, আমার যেন মনে হলো তোমার মধ্যে মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এটা তো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তোমার মতো লোকের কখনও এরকম অসুখ করতেই পারে না। তবে আমার মনে হয়, সেরকম কিছুই না, এটা একটা সকিং থেকে হঠাৎ হয়েছে।'

তাতে আমি কোনো সান্ত্বনা বোধ করলাম না। বললাম, 'মৃগী রোগ কি সকিং থেকে হতে পারে না ? মৃগী রোগের লক্ষণ কী ?'

বলতে বলতে আমি গেলাসে চুমুক দিলাম। ললিতা বললো, 'হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করা, হাত পায়ে খিচুনি ধরা বা ছোঁড়া, মুখ গোঁজড়ানো, ইত্যাদি।'

'আমার কি সেরকম হয়েছিল নাকি ?'

ললিতা এ কথার হঠাৎ কোনো জবাব দিল না। পৃথ্বীশ ফিরে এল। ললিতা ওর নিজের গেলাস নিয়ে চুমুক দিল। পৃথ্বীশ বললো, 'কি ব্যাপার, তোমরা যেন কেমন চুপচাপ ?'

আমি বললাম, 'আমার মধ্যে হঠাৎই কেমন একটা চেঞ্জ এসেছিল। আই ডিড সামথিং। হোয়াট আই কান্ট প্রোপারলি ডেস্‌ক্রাইব। ললিতার মনে হয়েছে, আমার মধ্যে মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।'

ললিতা বলে উঠলো, 'আমি মোটেই তা বলি নি। আমার মনে

হলো সকিং থেকে এরকম হয়েছে। অধীপ হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল, ওর সমস্ত শরীরে একটা আক্ষেপ। যাকে খানিকটা খিচুনির ভাব বলা যায়, আর গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। বোধহয় মিনিট খানেক, তারপরেই আবার ঠিক হয়ে গেল। আর সেটা হলো তখুনি যে মুহূর্তে আমি রূপার নাম নিয়েছি।'

পৃথ্বীশ বললো, 'এইটুকু সময়ের মধ্যে এতো ঘটনা ঘটে গেল?'

আমি অবাক হয়ে ললিতার দিকে চেয়ে বললাম, 'রূপার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম হবে কেন? আগেও তো রূপার নাম নিয়েছি।'

ললিতা গম্ভীর হয়েই বললো, 'নিয়েছি, সেটা গত রাত্রের ঘটনায়, পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনার সময়ে। এখন যখন রূপার নাম নেওয়া হয়েছিল, সে সময়ে তোমার মুড একটু অন্যরকম ছিল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কি রকম মুড?'

ললিতা বললো, 'সে কথা বলে কোনো লাভ নেই। তবে—।'

বলে ললিতা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওর ভাসা ভাসা সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। বললো, 'অধীপকুমার মিত্র মহাশয়, আজ প্রথম আবিষ্কৃত হলো, যে ভালবাসা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না বলতে, রূপার সঙ্গে সেই ভালবাসাই তোমার ছিল। তুমি নিজেও হয়তো জানতে না, রূপাকে তুমি ভালবাসো। তা না হলে রূপার নাম নেওয়া মাত্র তোমার এরকম ঘটতো না। এটা তোমার কাছে এখন ভয়ংকর সকিং। অবিশ্যি নিশ্চয়ই, রূপা যেভাবে মার্ডার হয়েছে সেটা এমনিতেই সকিং। কিন্তু তোমার কাছে তা ভিন্ন রকম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

ললিতা কথাগুলো বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আমি অন্তত কখনো আবিষ্কার করতে পারি নি, সেই

মিনিংলেস ভালবাসা ব্যাপারটা আমার জীবনে ঘটেছে, তাও আবার রূপার সঙ্গে। শী ওয়াজ রিয়্যালি চার্মিং। এনি টাইম আই হার্ড হার ভয়েস ওভার টেলিফোন, মাই হার্ট ক্লিকড, আই ওয়াজ থার্স্টি ফর হার ওয়াণ্ডারফুল ফিজিক, বাট ভালবাসা আই ডোণ্ট নো ললিতা। তবে হ্যাঁ, আমার মনে হয় ওর ডেডবডিটা আমার নিজের চোখে না দেখলেই বোধহয় ভালো হতো। তারপরে ডাক্তারের মুখে যখন শুনলাম, একটা ফর্ক গলায় ঢুকিয়ে—।'

ললিতা আমার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল। বললো, 'এ প্রসঙ্গই থাক অধীপ।'

এই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হলো, ললিতার চোখে একটা বিষণ্ণতার গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে। ওর মনের মধ্যে যেন একটা কষ্ট। তার কারণটা বোঝবার মতো অনুভূতিও আমার আছে। যে ভালবাসা নিয়ে আমি বলতে গেলে একটা ক্যালাস ধারণা ছাড়া কিছুই কখনো বুঝি নি, রূপার প্রতি আমার সেই ভালবাসা আবিষ্কারই ওর বিষণ্ণতার মূল। যদিচ, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, ভালবাসা নামে ব্যাপারটা রূপার সঙ্গে আমার কখনোই ঘটে নি।

হেসে বললাম, 'তাহলে পুরোপুরি তোমার প্রসঙ্গে আসা যাক?'

বলেই আমি আমার গেলাস শূন্য করে দিলাম। ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'আমার প্রসঙ্গটা কী?'

আমি ওর গালে আল্‌তো করে ঠোঁট স্পর্শ করলাম। পৃথ্বীশ বললো, 'বেড়ালটাকে এবার ঘর ছাড়তে হয়।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'ইয়ার্কি ছাড়ো, আমাকে আর একটা পেগ দাও।'

ললিতা বলে উঠলো, 'নো মোর। পৃথ্বীশ, ওকে আর দিও না, অল্‌রেডি আটটা পনেরো। ওর সাড়ে আটটায় বাড়ি যাবার কথা।

এবং যাওয়া উচিতও, কারণ রমা নিশ্চয় খুব চিন্তায় আছে। তাছাড়া আমার মনে হয়, পৃথ্বীশ, তুমি অধীপের সঙ্গে ওর বাড়ি অবধি যাও।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছো আমি আবার কোথাও ড্রিংকের জন্য ঢুঁ মারবো?'

ললিতা বললো, 'সেজন্য বলি নি। তোমার শরীর আর মনের কথা ভেবে বলছি।'

আমি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মোটেই না, আমার কিছুই হয় নি। আমি বাড়ি গিয়ে তোমাকে টেলিফোন করছি।'

পৃথ্বীশ বললো, 'চলো না ঘুরেই আসি।'

'এনজয় য়োর ড্রিংক অ্যাণ্ড'—ললিতাকে চোখের কোণে দেখিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, 'গুডনাইট।'

ওরা দুজনেই গুডনাইট করলো। আমি নিচে নেমে গেলাম।



আমি গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়িই এলাম। আসবার সময় কেবলই আমার মনে হলো, একটা গাড়ি আমাকে সব সময়ে ফলো করছে। কিংবা হয়তো আমি ভুলও ভাবতে পারি। আমি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই নাথু গ্যারেজের দরজা খুলে দিল। আমি গাড়ি ঢুকিয়ে সোজা ওপরে চলে গেলাম। রমা দেখলাম সত্যি খুব উদ্বিগ্ন মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'এসেছ? আমি যে কী ভয় পাচ্ছিলাম। সারাটা দিন আমার খুব খারাপ কেটেছে।'

এত তাড়াতাড়ি আমি কোনোদিনই বাড়ি ফিরি না। আজ আমার ছেলেমেয়েরাও জেগে রয়েছে। আমার মেয়ে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমাদের বাড়িতে পুলিস এসেছিল কেন ? তোমার ট্রাউজার শার্ট সব দেখেছে, নিয়ে গেছে।'

আমি রমার চোখের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম আমার ছেলেও ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সকলেই খুব ভয় পেয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। আমি গলার টাইটা ঢিল করে বসে বললাম, 'বসো, তোমাদের সবাইকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলি।'

রূপার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বা ড্রিংক ইত্যাদি প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি মোটামুটি খুনের ঘটনাটা বললাম, এবং এটাও ওদের বুঝিয়ে দিলাম, যেহেতু গতকাল আমি সেখানে গেছলাম, সেই হেতু পুলিসকে অনুসন্ধান করে দেখতে হচ্ছে, কে খুন করতে পারে। পুলিস তার নিজের কর্তব্যই করছে, এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ, আমি তো আর সত্যি সত্যি খুন করি নি। তথাপি আমার পুত্র কন্যার আরো অনেক কৌতূহলিত জিজ্ঞাসার জবাব আমাকে দিতে হলো। তারপরে ওরা শুতে গেল। রমা আমার সামনে সরে এসে আমার গলা থেকে টাইটা পুরোপুরি খুলে নিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, আমার আঙুলের কথা। বললাম, 'ডাক্তার দেখেছে, বলেছে কোনো-রকমে চেপটে গিয়েছিল। ওষুধও এনেছি, একবার মালিশও করেছি। ওষুধটা গাড়িতে ফেলে এসেছি, নাথুকে নিয়ে আসতে বলো।'

রমা নাথুকে ডেকে গাড়ি থেকে ওষুধ আনতে বলে চাবির কথা জিজ্ঞেস করলো। বললাম, 'পাওয়া গেছে, ওটা রূপার ঘরেই পড়েছিল।'

তারপরে ওকে বললাম, কী ভাবে রূপাকে হত্যা করা হয়েছে, এবং মৃতদেহের বর্ণনাও দিলাম। রমা শুনে শিউরে উঠলো। বললো, 'পুলিস কি তোমাকে সন্দেহ করেছে নাকি, যে তুমি মার্ডার করেছ ?'

আমি হেসে বললাম, 'পুলিস সবাইকে সন্দেহ করে, সেটাই তাদের কাজ। রূপার টেম্পরারি সারভেন্টকে ওরা অ্যারেস্ট করেছে। তার নাকি ভোরবেলার আগে ঘুমই ভাঙে নি। রূপার শোবার ঘরের স্কাইলাইটের দেওয়ালে পায়ের ছাপের মতো দাগ দেখা গেছে। আমি তো মনেই করতে পারছি না, কখন ওর ঘর থেকে চলে এসেছি। কেননা, তারপরেও আমি পৃথ্বীশের বাড়ি গেছলাম, চিকেন রোল কিনেছি, কিছুই আমার মনে নেই! আমার ব্ল্যাকআউটের ব্যাপারটা পুলিসকে আমি জানিয়েছি, ওদের ডাক্তারই বলেছে এরকম ব্ল্যাক-আউট হওয়া সম্ভব। তবে আমি একটা কথা মনে করতে পারছি না, কেন আমি ললিতাকে শুধু এ কথা বলেছিলাম, আমাকে মাফ করে দিও।'

রমা বললো, ড্রিংক করে এসে ওরকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তুমি অনেক বলো, যার কোনো ভিত্তি নেই। পরে দেখেছি, সেসব কথা তোমার নিজেরো মনে নেই। যাই হোক বাপু, পুলিসী ব্যাপারকেই আমার সব থেকে বেশি ভয় হয়।'

বললাম, 'জড়িয়ে যখন গেছি, তখন কিছু ঝামেলা হয়তো পোয়াতেই হবে। তবে আসলে তো এরা আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে, সেটা আমার ভাগ্য।'

বুঝতে পারলাম, রমার মনের মধ্যে, একটা অস্বস্তি বিঁধে রইলো। আমি বাইরের পোশাক ছেড়ে, বাথরুমে গেলাম। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ব্যথাটা এখনো বেশ রয়েছে। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতেই, আমার নিজেকে হঠাৎ ভীষণ একা এবং পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হলো। আর নিহত রূপার মূর্তি আবার আমার চোখে ভেসে উঠতেই, আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে, ঘরের মধ্যে চলে এলাম। কী কারণে রমা ঘরে এসেছিল, অবাক হয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?'

আমি স্বাভাবিকভাবে বলবার চেষ্টা করলাম, 'কিছু না, পায়জামা নিতে ভুলে গেছি।'

রমার চোখে মুখে বিস্ময় আরো নিবিড় হলো, এবং দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। বললো, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন কোনো কারণে ভয় পেয়েছ। তুমি বাড়ি আসার আগেই তো, আমি পায়জামা বাথরুমে রেখে দিয়েছি।'

আমি যে কিছু একটা গোপন করতে চাইছি, রমা বোধহয় সেটা বুঝতে পারছে। সেই রকম শিরদাঁড়ার কাঁপুনি বা, শিরদাঁড়ার নিচের প্রান্তে, গ্রন্থিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ হেনে যাওয়ার ঘটনা হয় তো ঘটতে পারতো, যেটা আমি রমাকে বলতে চাই না। অনেকটা স্বাভাবিক-ভাবেই, বাথরুমে উঁকি দিয়ে বললাম, 'ওহ্, সত্যিই, পায়জামা তো রয়েছে, আমি দেখিই নি। কিন্তু ভয় পাবো কেন? ভয় পাবার কিছুই ঘটে নি। ঠিক আছে, আমি হাতে মুখে জল দিয়ে নিচ্ছি।'

বলে, বাথরুমের দরজাটা বন্ধ না করেই, বেসিনের ট্যাপ খুলে, দু'হাতে জল নিয়ে মাথায় মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম। দরজাটা আমি ইচ্ছা করেই খুলে রাখলাম, কিন্তু রমা তার জন্য অবাক আরো বেশি হলো, এবং সেই সঙ্গে চিন্তিতও। ও সামনে থেকে সরে গেল। আমি হাত মুখ মুছে, পায়জামা পরে, বেরিয়ে এলাম। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে, মাথা আঁচড়ে, খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, রমা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বেশি রাত্রি হয় নি, আজ ও খায় নি। অন্যান্য দিন খেয়ে নেয়। আমাকে খেতে দিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা কথা বললো। বলা ঠিক না, জিজ্ঞেস করলো, এবং সব কটি কথাই রূপার সম্পর্কে। আমি মোটামুটিভাবে রূপার যে চিত্র ওকে দিলাম, তা হলো, একটি স্বেচ্ছাচারিণী ডিভোর্সি মেয়ে, যার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। আমি আসলে রূপার স্বামীর বন্ধু ছিলাম। কিন্তু সে এখন আর কলকাতায় আসে না। রূপা আসে, আর এলে আমাকে খবর দেয়.

তাই দেখা সাক্ষাৎ করতে যাই। আরো বললাম, রূপা অত্যন্ত সুরাসক্ত মেয়ে, এবং আরো অনেক ব্যাপারেই তার আসক্তি আছে। গতকাল তার ওখানে আমি প্রচুর পান করেছি, যে কারণে কিছুই প্রায় মনে করতে পারছি না।

আমার খাওয়া শেষ করে ওঠবার মুহূর্তে রমা বললো, 'একদিন তুমি রূপা নাম করে, ইংরেজিতে কিছু বলছিলে, প্রায় মাস ছয়েক আগে। যেন কোনো কবিতা আবৃত্তি করছিলে, তার মধ্যে কয়েকবার রূপার নাম নিয়েছিলে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কোনোদিন বলো নি তো?'

রমা বললো, 'বলে লাভ কী? তুমি কি মনে করতে পারতে? ও রকম কতো নাম, কতো সময় তুমি বলে থাকো, আমারই সব মনে থাকে না।'

আমি রমার দিকে তাকিয়েছিলাম। রমা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, টেবলে নিজের খাবার নিয়ে বসলো। আমি বেসিনের কাছে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপরে একটু হেসে বললাম, 'পাগলামি।'

রমা আমার দিকে না তাকিয়ে খাবার খেতে লাগলো। আমি শোবার ঘরে গেলাম। সিগারেট ধরিয়ে, প্রথমেই আমার দৃষ্টি পড়লো, মাঝখানের দরজার দিকে। পাশের ঘরেই, আমার ছেলে-মেয়েরা শোয়। পাশের ঘরে যাবার দরজাটা ভেজানো আছে। রমা মেয়ের সঙ্গে এক খাটে শোয়। এ'ঘরে আমি একলা শুই। আমি আমার খাটের বিছানার দিকে দেখলাম। বেডকভার গোটানো। ক্রীম রঙের এমব্রয়ডারি করা চাদর পাতা। রমা বিছানা তৈরি করেই রাখে। কোনো কোনো দিন আমি এসেই শুয়ে পড়ি। কখন কী অবস্থায় আসি, ঠিক থাকে না বলে, ও আগে থেকেই বিছানা প্রস্তুত করে রাখে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। খাবার ঘরের পাশে, বসবার ঘরে টেলিফোন। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম। রিসিভার তুলে বললাম, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে ললিতার স্বর শোনা গেল, 'কী হলো, ফিরে গিয়ে টেলিফোন করবে বলেছিলে যে? কখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

বললাম, 'দুঃখিত। আসলে আমি ঠিক সময়ে, ঠিকভাবেই চলে এসেছি বলে আর টেলিফোন করি নি।'

ললিতা বললো, 'কিন্তু সে কথাটাই জানবার ছিল। যাই হোক, লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে পড়ো। এখন থেকে রাত্রি করে বাড়ি ফেরাটা ছাড়ো।'

বললাম, 'আজ থেকেই তো ছেড়ে দিলাম।'

ললিতার একটু হাসি, এবং তারপরে কথা শোনা গেল, 'আজ থেকেই? দেখা যাক। আশাকরি কাল দেখা হবে?'

'আশা করছি।'

'ছাড়লাম।'

'গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে, খাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রমা নেই। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ও ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে, খোঁপা খুলছে। মুখ নড়ছে, মসলা চিবোচ্ছে। খোঁপা খুলে মাথায় চিরুনি টানতে লাগলো। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও আয়নায় আমার দিকে তাকালো। আমি নিচু হয়ে, ওর মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে, ঠোঁটে চুমো খেলাম। ও ভেজা ঠোঁট দুটো নিয়ে, আয়নায় আমার দিকে তাকিয়ে, একভাবেই চিরুনি টানতে লাগলো।

আমি বললাম, 'আজ রাত্রে তুমি আমার কাছে শোবে।'

রমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সারা রাত?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অসুবিধা আছে ?'

রমা এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। ওর চোখে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা, ভুরু কোঁচকানো। বললো, 'কী যে বলো। তুমি কি সারারাত আমার সঙ্গে শোও নাকি ? তা ছাড়া, মেয়ে আমার সঙ্গে শোয়। ঘুম ভেঙে গেলে, আমাকে খুঁজবে। তুমি ঠাট্টা করছো বুঝি ?'

কথাটা রমার কাছে ঠাট্টা মনে হওয়া স্বাভাবিক। ছেলেমেয়ে হবার আগে, যদি বা কিছুকাল দুজনে এক বিছানায় শুয়ে থাকি, হবার পরে, সাময়িক সহবাস ছাড়া, সারারাত্র কখনো একসঙ্গে থাকি নি। নানান কারণেই তা সম্ভব ছিল না। রমা কখনোই আয়া বা ধাত্রীদের হাতে ছেলেমেয়ে ছেড়ে থাকতে রাজী ছিল না। ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে ওঠার প্রশ্নও ছিল। যদিচ, ছেলেমেয়েদের একটা বয়স অবধি, তাদের সঙ্গে, তাদের মাকে নিয়ে, বাবার এক শয্যায় শোয়াটাকে আমি বিশেষ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি, যা পশ্চিমের চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে মেলে না। অঙ্কুরেই ছেলেমেয়েদের বাবা মায়ের যুগল শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুভ ব্যাপার না। বরং তারা বাবা মায়ের সঙ্গে নিজেরাও শয্যার অংশীদার, উভয়ের স্নেহ ভোগ এবং সেই কারণে বাবা মায়ের সম্পর্ক বিষয়ে নিজেদের আস্থা ও নিশ্চিন্ত-বোধকে বাড়িয়ে তোলা, তাদের মানসিক ক্ষেত্রের পক্ষে শুভ। বাবা মা নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েদের সামনে তাদের যৌন আচরণ করবে না। আবার এমন আচরণ করা উচিত না, যা বিপজ্জনক গোপনীয় বলে চিহ্নিত করা যায়। বাবা মায়ের মধ্যে গভীর ভাব এবং বন্ধুত্ব আছে, এবং তাদের দ্বারা তারা উৎপাদিত, অস্পষ্টভাবে হলেও, তা বুঝতে দেওয়া উচিত। বাবা মায়ের নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে, অহেতুক তাদের বঞ্চিত করা উচিত না, বাবা মায়ের নিবিড় বন্ধুত্বের ভাগ তাদেরও প্রাপ্য, এবং তাতে সুফলই পাবার কথা। যে ছেলেমেয়েরা জীবনে

কখনো বাবা মায়ের দাম্পত্য সংস্পর্শে থাকে নি, তাদের মনে যৌন প্রশ্ন বা অনুভূতি, নানা কারণেই অনেক আগে জেগে যেতে পারে।) তাকে ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রশ্নই নেই।

কথাগুলো আজ না মনে হলেই পারতো। হঠাৎ এই সব চিন্তা, অনেকটা উপদেশাবলীর মতো আমার মনে জেগে উঠলো, যা আমি রমাকে শোনাতে পারি না। আমার সঙ্গে এক শয্যায় থাকতে, রমা কখনো আপত্তি করে নি। আমরাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিলাম, আমাদের আলাদা ঘরে আলাদা বিছানায় শোয়া ভালো। কলকাতায় নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরিতে, অনেক বড় লোক বাঙালীরা সাহেবদের মতোই, জন্মের পরক্ষণে, সন্তানদের ধাত্রীর হাতে সমর্পণ করতো, একটু বড় হলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে। দিনান্তে একবার মায়ের আদর কপালে জুটলেও, বাবা মায়ের দৈনন্দিন জীবন যাপনে, কোথাও তাদের ছায়াপাত হতো না, জানতেও পারতো না সেই জীবনচিত্রের স্বরূপ, যদিচ, সেইভাবেই পালিত সন্তানদের মধ্যে, পরবর্তীকালে কেউ কেউ প্রতিভাধর হয়েছেন, কিন্তু সেটাই সঠিক ফর্মুলা না।

আমি টেবিলের সামনে সরে গিয়ে, আর একটা সিগারেট ধরালাম। জানি, রমার মনে বিশেষ কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা, এবং ও চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে, আমার দিকে দেখছে। কিন্তু ও কোনো দুশ্চিন্তা করতে পারে ভেবে, আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম, বললাম, 'এমনি হঠাৎ মনে হলো, আজ তোমাকে নিয়ে শুই।'

রমা চুল আঁচড়ানো শেষ করে, আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর চুল আগের তুলনায় কিছুটা পাতলা হলেও, দু'পাশে ছড়ানো খোলা চুলে, এখনো সাবেক দিনের ছবিটা যেন ভেসে ওঠে। জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি?'

আমি ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে, কাছে টেনে বললাম, 'সত্যি। কিন্তু তা বলে মেয়েকে একলা রেখে, সত্যি সত্যি তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে না।'

রমা সরলভাবেই জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি একলা শুতে অস্বস্তি হচ্ছে?'

প্রকৃত সত্যি শুনে, আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললাম, 'না না, অস্বস্তি আবার কিসের। মনটা ভালো নেই, এই যা।'

এবং আমার কোনো অস্বস্তি নেই, এটা বোঝাবার জন্যই, আমি ওকে বুকের কাছে চেপে ধরে, ওর গালে গাল ঠেকিয়ে বললাম, 'সারারাত না হোক, এখন আমি তোমাকে ছাড়বো না।'

আমি জানি না, রমা কী বুঝলো। ও দু' হাত আমার ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে বললো, 'তোমার ঘুম না আসা পর্যন্ত, আমি তোমার কাছে থাকবো।'

আমি ওর ঠোঁট দুটি আগ্রাসী চুম্বনে নিজের মধ্যে নিলাম, তারপরে ও নিজেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে, দংশিত চুম্বনে আদর জানিয়ে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, 'তুমি শোও, আমি আসছি।'

নিজেকে আমার কেমন অস্বাভাবিক লাগছে, যেন এই আমি ঠিক আমি না। আমি রমার জন্য যেন খুবই ব্যাকুলতা বোধ করছি, কারণ নিঃসঙ্গতা আমি সহ্য করতে পারছি না, এবং জেগে থাকা অবস্থায়, অন্ধকারে থাকা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। রমা ঘরে এসে, আলো নিভিয়ে দিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম, অন্ধকার। মনে হলো, আমি যেন এইমাত্র পাশ ফিরে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এবং হঠাৎ-ই তন্দ্রা ভেঙে গেল। ঘুমের কোনো অনুভূতি নেই। আমি উঠে বসলাম। কোনো জড়তা নেই বলেই, আমি তাড়াতাড়ি

উঠে, খাট থেকে নেমে আলো জ্বাললাম। দেখলাম মাঝখানের দরজাটা খোলা, ভিতরে কিছু দেখা যায় না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি, আমি ছাড়াও আমার মধ্যে যেন কেউ অবস্থান করছে, আর সে আমাকে কোথাও টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। অথচ সেরকম কোনো ভূতুড়ে ব্যাপার আমার পক্ষে সম্ভব না যে, আমি হঠাৎ কোথাও চলতে আরম্ভ করবো। মনে হচ্ছে, আমি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, যেখান থেকে এক পা বাড়ালেই, অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো। এসব কিসের লক্ষণ আমি জানি না। হঠাৎ মনে হলো, আমার দাঁতে দাঁত চেপে বসছে, হাত মুঠি পাকিয়ে উঠছে, এবং শিরদাঁড়ার কাছে একটা বিদ্যুতের ঝাপটা। আমি ডেকে উঠলাম, 'রমা, রমা।'

এই ডাক আমার কানে যেতেই, আমি নিজেই চমকে উঠলাম। রমা ঘুম চোখে মাঝখানের দরজায় এসে দাঁড়ালো, বললো, 'কী হয়েছে?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন ক'টা বেজেছে?'

রমা এগিয়ে আসতে আসতে বললো, 'দেখছি। ভোর হয়ে গেছে।'

রমা ড্রয়ার খুলে, আমার ঘড়িটা দেখে বললো, 'সাড়ে পাঁচটা। এত তাড়াতাড়ি তোমার ঘুম ভাঙলো? স্বপ্ন দেখেছিলে নাকি?'

বললাম, 'না তো।'

আমি টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতেই, রমা তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে বললো, 'থাক, আর সিগারেট ধরাতে হবে না। চলো, আর একটু শোবে।'

বলে ও আলো নিভিয়ে দিয়ে, আমার হাত ধরে খাটের কাছে টেনে নিয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই আমার মনে পড়লো, গতরাত্রে, আমরা দুজনেই, পরস্পরকে উপভোগ করেছি, এবং রমাকে জড়িয়ে

ধরেই ঘুমিয়ে ছিলাম। এবং এখনো আমরা পরস্পরকে একইভাবে আলিঙ্গন করে, আচরণে প্রবৃত্ত হলাম। তারপরে আবার ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।

সকালবেলা স্বাভাবিক নিয়মে স্নান প্রাতঃরাশ সেরে অফিসে বেরোলাম। রমা একবার বললো, 'তোমার মুখে কেমন একটা ছাপ পড়েছে।'

আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে, তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না। আঙুলের ব্যথা আর ফোলাটা একটু কম মনে হলো।



ছুপুরের লাঞ্চ আওয়ারের মুখেই সেই ডি ডি ভদ্রলোক এলেন। আমি ওঁকে অভ্যর্থনা করলাম। উনি বসে বললেন, মিসেস চৌধুরীর মার্ডার খুবই মিস্টিরিয়াস। গেলাসে বোতলে টেবিলে বিছানায় সর্বত্রই আপনাদের ছু'জনের হাত পায়ের ছাপ। চাকরের হাত পায়ের ছাপও পাওয়া যাচ্ছে। তবে সেটা ভাইটাল ব্যাপার কিছু না—মানে মার্ডারের সঙ্গে তেমন কোনো যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে এই নয় কি যে, সে মার্ডার করতে পারে না। তবে স্কাইলাইটের ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারণ বাইরের দেওয়ালে কোনো ছাপটাপ দেখা যাচ্ছে না। খুনী একটা ধাপ্পা দেবার জন্যও, স্কাইলাইটের কাছে দাগ লাগাতে পারে।'

আমি খানিকটা অসহায় বিস্ময়ে বললাম, 'তাই নাকি ? আশ্চর্য!

যতোই শুনছি, আমারো কেবল মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না, এ খুনের তাৎপর্য কী, মোটিভই বা কী, কে-ই বা এমন কাজ করতে পারে।'

ডি ডি হেসে বললেন, 'তা হলে তো কালপ্রিটকে ধরা সহজ হতো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেসিক্যালি, এ মার্ডারের কোনো মোটিভ আমরা খুঁজে পাই নি।'

বলে, ভদ্রলোক আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, পরশু রাত্রে কি আপনার ডান হাতের বুড়ো আঙুলে লেগেছিল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই দেখুন না এখনো ফুলে আছে। অথচ কিছুই মনে করতে পারছি না, কী ভাবে লেগেছিল।'

ডি ডি হেসে বললেন, 'আমি জানি কী ভাবে লেগেছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি? কী ভাবে বলুন তো?'

'আপনি মিসেস চৌধুরীর ডাইনিং স্পেসে, ফ্রিজ থেকে সোডার বোতল আনতে গিয়ে নিজের আঙুলসুদ্ধ দরজাটা চেপে দিয়েছিলেন, অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গেই খুলে নেন, এবং চুষতে আরম্ভ করেন।'

'কী করে আপনি জানলেন?'

মিসেস চৌধুরীর সারভেন্ট ব্যাপারটা দেখেছে। ডাইনিং হল অন্ধকার ছিল, আপনি ভেবেছিলেন, কেউ আপনাকে দেখছে না। কারণ আপনি তখন—আই মীন ফুল ন্যাকেড ছিলেন।'

বলে ডি ডি মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। আমি লজ্জায় কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলাম না। এর পরে আর বুঝতে বাকী থাকে না, আমি আর রূপা কতোখানি মাতামাতি করেছিলাম। তার মানে আমি আর রূপা, দুজনেই বোধহয়, নগ্ন ছিলাম। এখন সুস্থ অবস্থায় ভাবতেই পারছি না, চাকরটা আর কী দেখেছিল। সে হয়তো আমার আর রূপার সব আচরণই দেখেছে। আমার সংকুচিত ভাবনার মধ্যেই, ডি ডি বলে উঠলেন, 'তারপরেই অবিশ্যি, চাকরটি রান্নাঘরের

দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। কেননা, সে ধরে নিয়েছিল, আপনি কখন মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে বিদায় নেবেন, তার কোনো ঠিক নেই। আপনি বিদায় না নিলে, তার ছুটির কোনো প্রশ্ন নেই। তার বক্তব্য হচ্ছে, সে ভেবেছিল, মেমসাহেব তাকে ডেকে তুলে, ছুটি দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবেন। তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙে ভোরের দিকে। যদি ওর কথা সত্যি হয়—তারপরে সে মিসেস চৌধুরীকে সেই অবস্থায় দেখতে পায়।'

আমি হেসে বললাম, 'তা হলে খুনের দায়টা দেখছি আমার ওপরেই এসে পড়ে।'

ডি ডি হেসে উঠলেন, বললেন, 'এখনো তার কোনো ডেফিনিট প্রমাণ আমাদের হাতে আসে নি। এলে তার ব্যবস্থা করবো। তবে আপাতত আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি, আপনার পোশাকে কোথাও রক্তের দাগ পাওয়া যায় নি। আপনার ধুয়ে ফেলা গেঞ্জি জাঙিয়াও টেস্ট করা হয়েছে। অনেক সময় ধুয়ে ফেলার পরেও কিছু চিহ্ন থেকে যায়। কিছুই পাওয়া যায় নি! ময়না তদন্তে জানা গেছে, মিসেস চৌধুরীকে কেউ গায়ের জামা ধরে টেনে ছিঁড়ে খামচালেও জোর করে তাঁকে কেউ রেপ্ করে নি। তিনি যে স্ব-ইচ্ছায় সেক্স এনজয় করেছেন বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় তাই জানা গেছে, তাতে জামা ছেঁড়া বা আঁচড়ানোর সঙ্গে ব্যাপারটা মেলানো যাচ্ছে না। হতে পারে, কেউ চেষ্টা করেছিল, আপনি চলে যাবার পরে, পারে নি বলেই ফর্ক গলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাথরুমের বেসিনে দু-এক ফোঁটা রক্ত দেখা গেছে, সেটা মিসেস চৌধুরীরই রক্ত। পাওয়া যাচ্ছে না কেবল ফর্কটার সন্ধান। আপনি যদি আপনার মেমারি একটু রিকালেক্ট করতে পারতেন, তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেতো।'

বললাম, 'আপনাকে কী বলবো, অল্‌মোস্ট আয়াম সাফারিং টেরিবলি, শুধু মনে রাখতে পারার জন্য। কিন্তু আমি জানি গভীর

সমুদ্রে একটি কয়েন ডুবে গেলে তার সন্ধান পাওয়া যায় না, এও সেইরকম। আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। অথচ তার জন্য একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করছি।'

ডি ডি বললেন, 'আই ফীল ইট মিঃ মিত্র, য়ু ওঅ্যার ভেরি ফণ্ড অব্ হার। আমরা আশে পাশের ফ্ল্যাটগুলোতেও জিজ্ঞেস করেছি, মিসেস চৌধুরী কলকাতায় এলেই যে আপনি ওঁর কাছে যেতেন, এটা অনেকেই জানে। তবে আরো দু-একজনকে কখনো-সখনো দেখা গেছে, তাদের কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারছে না। আপনি কি জানেন, ওঁর কাছে আর কে আসতো?'

আমি বললাম, 'এলেও আমাকে জানিয়ে আসতো না বা রূপাও আমাকে কখনো বলে নি। তবে, শী ওয়াজ ভোলাপচুয়াস্ টাইপ। আদার বয়ফ্রেণ্ড থাকাটা আশ্চর্যের না।'

ডি ডি বললেন, 'আমরা ওঁর বাবা আর পিসীমার খোঁজ পেয়েছি। দেখলাম, ওঁরা মিসেস চৌধুরীর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। ডিভোর্সের ব্যাপারে ওঁরা নিজেদের মেয়েকেই দোষী ভাবেন। সেইজন্যই দেখা সাক্ষাৎ হতো না।'

আমি বললাম, 'এরকম অনুমান আমারো ছিল। ও কলকাতায় এলে, কখনোই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতো না, অথচ আমি জানতাম, ওর বাবা কলকাতায় রয়েছেন।'

ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মিঃ মিত্র, আপনি কি মিসেস চৌধুরীর স্বামীর কথা কিছু বলতে পারেন? হিজ হোয়ারাবাউটস্— কোথায় আছেন, কী করেন?'

আমি বললাম, 'না।'

বলেই, একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কেন না, কথাটা একটু বিশদভাবে বলা দরকার। আমি আমার চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বললাম, আপনাকে আমি পরিষ্কার করেই বলি। রূপার সঙ্গে

আমার প্রথম পরিচয় বন্ধুপত্নী হিসাবেই। ওর স্বামী আমার বন্ধু ছিল, নাম হারীন চৌধুরী। ওর চাকরিটা ছিল একটা ফরেন ফার্মে, কন্ট্রাক্ট বেসিসে। প্রচুর টাকা বেতন পেতো। রূপা তখন এরকম ছিল না—মানে এরকম ফাস্ট লাইফ ছিল না, ভোলাপচুয়াসের কোনো প্রশ্নই ছিল না। শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে, মিষ্টি স্বভাব। মিষ্টি স্বভাবটা বরাবরই ছিল, কিন্তু ওর শেষের দিকের জীবনের জন্য, হারীনই দায়ী। হারীনই ওকে ড্রিংকে আসক্ত করে, ক্লাবে, বারে, নানান জায়গায় নিয়ে যেতো, বাড়িতেও প্রায়ই পার্টি লেগে থাকতো। তারপরে হারীন নিজেই পস্তাতে আরম্ভ করেছিল, ফলে দু'জনের মধ্যে ক্ল্যাশ। দুজনেই সমান এগোয়িস্ট, কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী না। রূপাই প্রথমে বম্বে চলে গেল একটা চাকরি নিয়ে। হারীন ডিভোর্স ফাইল করলো। রূপা কনটেসট্ করলো না, কারণ খোরপোষের দাবি ওর ছিল না। একতরফা ডিক্রিতে, অনায়াসেই ডিভোর্স হয়ে গেল। কেবল একটা ব্যাপারে রূপা জেদ ধরেছিল, ছেলেকে তার চাই। যা ভেবেই হোক, হারীন রাজী হয়েছিল। তারপরে হারীন কলকাতা ছেড়ে, প্রথমে যায় দিল্লী। সেখান থেকে, অন্য একটা ফরেন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে হায়দ্রাবাদ। সে আবার বিয়ে করেছে, বৌ নিয়ে কলকাতায় এসেছে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নি। বলতে গেলে, সে তার কলকাতার পুরনো দিনের বন্ধু বান্ধব, সবাইকেই ত্যাগ করেছে। তার কারণও আছে।'

আমি থামলাম। ডি ডি গম্ভীর মনোনিবেশের সঙ্গে, আমার কথা শুনছেন। কিছু না বলে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জানি না, ডি ডিকে এসব কথা বলা আমার উচিত হচ্ছে কী না, যদিচ আমার দিক থেকে গোপনীয়তার কিছুই নেই। অস্বীকার করবো না, রূপাকে প্রথম দেখা থেকেই, আমার মন যথেষ্ট আর্দ্র ছিল।

রূপা তা জানতো, কিন্তু রূপা দয়া না করলে কারোরই কিছু পাবার ছিল না। রূপা হয় তো আমার মনের কথা জানতো, তথাপি প্রেম নিবেদনের কোনো অবকাশই তখন পাই নি। ঈর্ষা কাতরতায় যে ভুগি নি, তা বলা চলে না। বললাম, 'হারীনের বন্ধুরা অনেকেই রূপাকে নিয়ে মেতেছিল, রূপাকে নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক কমপিটিশনও ছিল।'

ডি ডি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও কি তাদের মধ্যে একজন কমপিটিটর?'

ডি ডি-এর ঠোঁটের কোণে হাসি, দৃষ্টি আমার চোখের ওপর। বললাম, 'তা একরকম বলতে পারেন, আমি রূপার সম্পর্কে খুবই দুর্বল ছিলাম।'

ডি ডি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কমপিটিশন নিশ্চয় ইদানীং কালে আরো বেড়েছিল; বিশেষত উনি যখন আবার ডিভোর্সি?'

আমি একটু থমকে গেলাম, তারপরে বললাম, 'না, ইদানীং কমপিটিশনের কোনো ব্যাপারই ছিল না। রূপা কলকাতায় থাকতো না, বছরে দু'তিনবার কয়েকদিনের জন্য আসতো। ও হঠাৎ কখন কলকাতায় আসতো না আসতো, ও নিজে থেকে কারোকে না জানালে, জানবার উপায় ছিল না। যে বম্বেতে থাকে, তাকে নিয়ে কলকাতায় কমপিটিশন চলতে পারে না। যে কারণে আপনাকে আমি বলেছি, তার আর কোনো বয়ফ্রেণ্ড কলকাতায় থাকলেও, বা দেখা সাক্ষাৎ করলেও, আমার তা জানা নেই। আমাকে ও সে সব বলতো না। তবে থাকাটা কিছু অসম্ভব না।'

ডি ডি একটু চুপ করে রইলেন, ভদ্রলোককে চিন্তিত আর গম্ভীর মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আগের দিনের, দু' চারজন বন্ধুর নাম ধাম বলতে পারেন?'

'পারি।'

আমি কয়েকজনের নাম ঠিকানা বললাম। ডি ডি একটি নোটবুকে তা টুকে নিয়ে বললেন, 'যে ফ্ল্যাটটা উনি কিনেছেন, এটা কতোদিন আগে কিনেছেন, আপনি জানেন?'

বললাম, 'জানি। ফ্ল্যাটের ব্যাপারে, ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম। ধরুন প্রায় বছর চারেক আগে ফ্ল্যাটটা কিনেছিল।'

ডি ডি আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'বুঝেছি। তা হলে বলা যায়, ইদানীংকালে, আপনার সঙ্গেই মিসেস চৌধুরীর বেশি অন্তরঙ্গতা ছিল।'

আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'তা বলতে পারেন।'

ডি ডি বললেন, 'সেটা অনুমান করাই যায়। তারপরে বলুন, আপনি গোড়া থেকে কী বলতে চাইছিলেন।'

আমি বললাম, 'হারীনের কথা বলতে চাইছিলাম। এখন যে সে কোথায় আছে, কিছুই জানি না। হয় তো রূপা খবর রাখতো। কিন্তু সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। আমিও জিজ্ঞেস করার দরকার বোধ করতাম না। রূপারও দরকার করতো না। হারীনকে আমরা ভুলেই গেছি। সেইজন্যই বলছিলাম, তার হোয়ারাবাউটস্ কিছুই বলতে পারবো না।'

ডি ডি ঘাড় ঝাঁকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসেস চৌধুরীর ছেলের বয়স কতো হবে?'

'বছর এগারো বারো হবে।'

'তাকে এ খবর জানাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মিসেস চৌধুরীর বম্বের অফিসের ঠিকানা আমরা পেয়েছি, যোগাযোগও করা হয়েছে। বম্বের পুলিসের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করেছি। মিসেস চৌধুরীর পরিচিত লোক, যাদের সঙ্গে উনি ওখানে মেলামেশা

করতেন, সব খবরই আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি। দেখা যাক কী হয়।'

আমি অবিশ্যি এতোখানি ভাবতে পারি না, বম্বে থেকে কেউ এসে, রূপাকে খুন করে গিয়েছে। কিন্তু যদি সেরকম মোটিভ কারোর থেকে থাকে, একেবারে অসম্ভব কিছু না। ওত পেতে থেকে, সুযোগ বুঝে, হয় তো কাজ মিটিয়ে সরে পড়েছে। এরকম হতে পারে, আমি হয় তো দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে এসেছিলাম। রূপা ইনটকসি-কেটেড অবস্থায়, অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছিল। চাকরটা ঘুমোচ্ছিল, রান্নাঘরে। সেই অবকাশে আততায়ী ঢুকে পড়েছিল। এরকম ক্ষেত্রে দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে ফ্ল্যাটের গেট অতিক্রম করা সম্ভব না। কিন্তু কে দেখছে, বা সন্দেহ করছে? এতোবড় ম্যানসন। এতো লোকের যাতায়াত। দারোয়ানের পক্ষে কারোকে সন্দেহ করা কঠিন।

ডি ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছেন মিঃ মিত্র?'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আপনার কথাই ভাবছি—ভাবছি বম্বের কারোর পক্ষে একাজ করা সম্ভব কী না?'

'কী মনে হয় আপনার?'

'মোটিভ থাকলে, অসম্ভব কিছু না।'

'ঠিক বলেছেন, আমাদেরও তাই সন্দেহ। আচ্ছা মিঃ মিত্র, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। পরশু রাত্রে মিসেস চৌধুরীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে, আপনি মিসেস চক্রবর্তীর বাড়ি গেছলেন। তাঁকে আপনি বলেছিলেন, ক্ষমা করে দিও। কথাটা কেন বলে-ছিলেন, মনে আছে?'

আমি মাথা নেড়ে, নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'না। আমি যে ললিতাদের বাড়ি গেছলাম, তাও আমার মনে নেই।'

ডি ডি চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, 'সেটাই হয়েছে মুশকিল। আপনার মেমারি যদি—।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এটা মেমারির ব্যাপারই না, টোটাল ব্ল্যাক আউট। এখান থেকে কিছুই রিকালেকট করা সম্ভব না। পারলে আমিই শান্তি পেতাম।'

'তা ঠিক, আমি বুঝি, দ্যাট য়ু আর হেলপ্‌লেস্। সো উই আর ফিলিং হেলপ্‌লেস্।'

এ সময়েই, আমার বেয়ারা ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, 'আভি লাঞ্চ দেগা সাব ?'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আভি নেই।'

ডি ডি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আর বসবো না, চলি। আপনি লাঞ্চ সেরে নিন।'

আমি বললাম, 'আপনি বসুন না, আরো যদি কিছু জানবার থাকে, আমি বলছি।'

ডি ডি বললেন, 'দরকার হলে, আমি অনেকবার আপনার কাছে আসতে পারবো। হয়তো আসতেও হবে। তার জন্য লাঞ্চ বন্ধ করে, আমার কথার জবাব দিতে হবে না। আপনি বসুন, আমি চলি। আপনি তো কলকাতার বাইরে এখন যাচ্ছেন না ?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না, সেরকম কোনো দরকার এখন নেই।'

'ও কে, সো লঙ !' ডি ডি একটা হাত কপালের কাছে তুলে, বেরিয়ে গেলেন। আমি বসলাম।

আমি রূপার খুনের চিন্তাতেই ডুবে ছিলাম।

বেয়ারা শাদা বড় ন্যাপকিনে ট্রে ঢাকা দিয়ে আমার খাবার নিয়ে এল। ট্রে সামনে দিয়ে, জলের ফ্লাস্কটা সামনে রেখে চলে গেল। আমি ট্রের ঢাকনাটা খুললাম। স্যুপ্, টোস্ট, বাটার, মীট সসেজ, তারপরে···আমার চোখ একটি মাত্র বস্তুর ওপরে স্থির নিবদ্ধ হলো, ফর্ক। ঝকঝকে ফর্ক এখন আর খাবার মতো দেখাচ্ছে না, যেন একটা কঙ্কালের দংশনোদ্যত শাণিত দাঁতের মতো ঝকঝক করছে। তা এমনই ভয়ংকর আর ভয়াল মনে হলো, একটা উদ্যত ফণা বিষধর সাপের থেকেও সাংঘাতিক। আমার শিরদাঁড়ার নিম্নকেন্দ্রে যেন বিদ্যুৎ হেনে গেল আর সেই সাপের মতো অনুভূতিটা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমে আমার ঘাড়ের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের দিকে এগিয়ে চললো, এবং তখনই আমার সমস্ত শরীরে আক্ষেপ শুরু হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে কিছু একটা খামচে ধরার জন্য, আমি ট্রের খাবারের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, আমার মুখ গরম স্যুপের মধ্যে ডুবে গেল, এবং নিঃশ্বাস নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায়, মুখটা তুলে নিতে গিয়ে, ডিশটা উলটে গেল, তার গায়ে মুখটা ঘষতে লাগলাম। বেয়ারাকে চিৎকার করে ডাকতে চাইলাম, পারলাম না। আর কেবলই চেষ্টা করতে লাগলাম, নিজেকে ফিরে পাবার। কয়েক

মিনিটের মধ্যেই ফিরে পেলামও, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ রিভলভিং চেয়ারসুদ্ধ ঘুরে বসলাম। ন্যাপকিন টেনে মুখ মুছতে মুছতে দম নেবার চেষ্টা করতে করতে, পায়ের নিচে জুতো দিয়ে পুশবেল টিপলাম।

আমার পেছনে বেয়ারার গলা শুনতে পেলাম, 'হাঁ সাব।'

আমি মুখ না ফিরিয়েই বেয়ারাকে বললাম, 'সব কুছ্‌ লে যাও, পানীকা ফ্লাস্ক ছোড়কে।'

সে বোধহয় খুবই অবাক হলো। স্বাভাবিক, কারণ স্যুপের ডিশ উল্‌টে ট্রেতে পড়েছে, বাটার আর টোস্টের প্লেটেও ছলকে গিয়েছে। ছিটকে পড়েছে মিট আর সসেজের প্লেটেও। সে ট্রে নিয়ে চলে গেল। আমি উঠে আগে কোণের বেসিনের ওপরে একটা ছোট ঝোলানো আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম। আমার মুখের সমস্ত রক্ত যেন শুষে নিয়েছে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই, কপালে, নাকের পাশে কয়েকটি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কালি পড়েছে চোখের কোলে। মাথার সামনের চুলে এখনো স্যুপের খানিকটা লেগে রয়েছে। বেয়ারা নিশ্চয়ই দেখেছে, এবং আরো বেশি অবাক হয়েছে।

বেসিনের ট্যাপের মুখ খুলে, জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললাম। মুখ মুছে ড্রয়ার থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নিলাম। একটু ভালো লাগলেও, মুখের চেহারা একটুও বদলালো না। ফ্লাস্ক থেকে অনেকটা জল পান করলাম। কিন্তু আমার খিদে রয়েছে, খেতে পারছি না। অসম্ভব ক্লান্তি লাগছে। বোধহয় একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হতো, অথচ ঘুম আসছে না। এলে ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারতাম, যদিচ, এ সবই আমার ক্ষেত্রে নতুন। কাজের সময়, আমার কখনোই এরকম হয় না। যা ঘটছে, তা নিশ্চিতরূপেই স্নায়ুর কোনো গোলযোগ। কী ঘটতে পারে? আমার এই চেম্বারে বা বাড়িতে যদি এরকম ঘটে, সেটা একরকম।

কিন্তু বাইরে চলতে ফিরতে বা গাড়ি চালাতে চালাতে যদি এরকম ঘটে? দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে আমি অস্থিরতা বোধ করলাম। নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না, আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান ডক্টর ব্যানার্জিকে টেলিফোন করলাম। হসপিটাল থেকে ফিরে, এ সময়ে তিনি বাড়িতে, বিশেষ জরুরি কোনো কেস থাকলে দেখেন। সন্ধ্যায় নিজের চেম্বারে বসেন। তাঁকে টেলিফোনে পেয়ে বললাম, 'আমি এখনই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, গুরুতর কিছু ঘটেছে নাকি?'

বললাম, 'গুরুতরই বলা যায়।'

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো অ্যাকসিডেন্ট?'

বললাম, 'না। আমার নিজের শরীরের ব্যাপারে, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার।'

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন, 'সেটা এখনই করা দরকার? ওবেলা হতে পারে না? তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে পরামর্শ করা যেতো। শরীরে কোথাও কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি? সেই বুড়ো আঙুলের ব্যথা নাকি?'

'না, কোনো যন্ত্রণা-টন্ত্রণা না, বুড়ো আঙুলের ব্যথাও না। বরং তার চেয়ে কিছু বেশি, স্নায়ুঘটিত গোলমাল মনে হচ্ছে।'

'টেলিফোনে বলা যায়?'

আমি বুঝতে পারলাম, এ সময়টা ডাক্তারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক। সকাল থেকে হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি এসে, জরুরি কেস দেখার পরে, এখন খাওয়া আর বিশ্রামের সময়। মনে হলো, আমি একটু বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। লজ্জাও পেলাম, বললাম, 'বলতে একটু সময় লাগবে। ঠিক আছে, অফিস থেকে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে, আমি সোজা আপনার কাছে যাবো।'

ডক্টর ব্যানার্জি বোধহয় একটু বিচলিত বোধ করলেন, বললেন,

'আপনি যদি ইনস্ট্যাণ্ট বিপজ্জনক কিছু ঘটতে পারে মনে করেন, তা হলে চলে আসুন।'

আমি বললাম, 'না, তার দরকার নেই। আমি বিকালেই আপনার কাছে যাবো। আমার জন্য একটু বেশি সময় রাখবেন।'

ডক্টর ব্যানার্জি তথাপি একটু হেসে বললেন, 'একটু আর্লি নাইটে আপনাকে তো আবার বাড়িতে পাওয়া যাবে না। তা হলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে, বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতাম।'

'তারও দরকার হবে না, আমি আপনার চেম্বারেই যাবো।'

'তাই আসুন তা হলে।'

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখতেই, আমার অধস্তন অফিসার, উদ্বিগ্ন মুখে দরজা ঠেলে ঢুকলো, জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি শরীর খারাপ করেছে নাকি? সব খাবার ফিরিয়ে দিয়েছেন?'

আমার নিজের ঘরে একলা বসে থাকার চেয়ে, সহকর্মী পার্থ রায়কে পেয়ে স্বস্তিবোধ করলাম। বললাম, 'বসুন। 'হ্যাঁ, শরীরটা ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। টেলিফোনে ডাক্তারকে সে কথা বলছিলাম।'

পার্থ রায় আমার দিকে কেমন একটা অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখছে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি মাথা ঘুরে গেছিলো? পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন?'

বুঝতে পারছি, কেন সে এ কথা জিজ্ঞেস করছে। বেয়ারার মুখে সে স্যুপের ডিশ উল্‌টে পড়ে যাবার কথা শুনেছে, এবং হয়তো আরো শুনেছে, আমার চুলে স্যুপ লেগেছিল। কিন্তু প্রকৃত যা ঘটেছিল, তার থেকে মাথা ঘুরে যাওয়াটা অনেক সরল ব্যাখ্যা হয়। বললাম, 'হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হলো। যেন মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল, আর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, অবিশ্যি উইদ্‌ইন্‌ এ মোমেণ্ট আবার সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর আমি কিছুই বোধ করছি না।'

পার্থ রায়কে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দেখালো, বললো, 'আপনার প্রেশারটা ইদানীং দেখেছেন ?'

আমি জানি, এটাও একটা অনিবার্য প্রশ্ন, এবং অতিমাত্রায় সরল। আর এও জানি, আমার রক্তচাপের উচ্চনিম্নের ভারসাম্য ঠিকই আছে, সেখানে কোনো গোলযোগ নেই। তথাপি আমি একটু দ্বিধার সঙ্গে বললাম, 'যতদূর জানি, প্রেশার ঠিকই আছে।'

পার্থ রায় ব্যস্তভাবে বলে উঠলো, 'না না মিঃ মিত্র, এটা কোনো কাজের কথা না। আপনি আজই প্রেশারটা চেকআপ করান। বুকে কোনোরকম ব্যথাট্যথা— ?'

আর একটা অনিবার্য সরল জিজ্ঞাসা। বললাম, 'না কোনো ব্যথা ফীল্ করি নি। সেদিকে ঠিকই আছে মনে হয়।'

পার্থ রায় বললো, পুলিসের লোকেরা তো মানুষের মন বোঝে না। হয় তো, সেই মার্ডারের ব্যাপারে, আপনাকে অকারণ অনেকক্ষণ উত্ত্যক্ত করেছে, বাজে বাজে কথা জিজ্ঞেস করেছে, তাতেই আপনি অসুস্থ বোধ করেছেন।'

সম্ভবত পার্থ রায়ের আসল অভিযোগ বা আমার শরীর খারাপের কারণ, ডি ডি-র এতোক্ষণ থাকাকেই মনে করেছে। অনুমান করতে পারি, অফিসে এ বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনাও চলছে। পার্থ রায় সেইজন্যই হয় তো এসেছে, আমার কাছ থেকে সে নিজে কিছু জানতে পারে কী না। বললাম, 'না। যে ভদ্রলোক এসেছিলেন, উনি খুবই ভালো লোক। যে মহিলা খুন হয়েছেন, উনি আমার পরিচিত ছিলেন। ওঁরা খুনীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, সেইজন্য আমার সাহায্য ওঁদের দরকার।'

পার্থ রায় বললো, 'তা করুক। পুলিসের কথা তো, হয় তো আপনাকেই খুনী ভাবছে।'

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'না, তা ভাববে না, ভাববার কোনো কারণও নেই।'

'সে তো জানিই, এ আর বলবার কী আছে। তবু, খুনের দিন আপনি সেই মহিলার বাড়ি গেছলেন তো, পুলিস হয় তো তা থেকেই, একটা ধুন্দুমার ব্যাপার বাঁধিয়ে বসবে।'

আমি একটু অবাক হলাম পার্থ রায়ের কথা শুনে। আমি যে রূপার খুনের দিন, ওর বাড়ি গিয়েছিলাম, এ কথা পার্থ রায় বা অফিসের কারোকেই আমি বলি নি, বা রূপার খুনের যে-সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে, সেখানেও আমার নামের কোনো উল্লেখ নেই। তথাপি পার্থ রায়—তার মানে, সমস্ত অফিসের লোকই খবরটা শুনেছে। নিশ্চয়ই পুলিসের লোক বা আমার স্ত্রী অথবা ললিতা এবং ওর স্বামী এসে, অফিসে খবরটা জানিয়ে যায় নি। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, যে ভাবেই হোক, খবরটা প্রকাশ পেয়েছে, বেশ কিছুটা রটনাও হয়েছে। পরিণতি কী, আমার জানা নেই। হয় তো কিছু গুজব রটনা, নিজেদের মনের মতো গল্প বানানো। প্রকৃত অর্থে, সেই জন্য আমার কিছু যায় আসে না। পুলিস যদি ঠিকমতো চেষ্টা করে, খুনীকে তারা নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবে। প্রকৃত ঘটনা, সব কল্পিত গল্পের ইতি টেনে দেবে। বললাম, 'পুলিস এতোটা বোকা বলে আমার মনে হয় না যে, একজন নির্দোষ লোককে তারা খুনী বলে চালিয়ে দেবে। দেখা যাক, কী দাঁড়ায়।'

পার্থ রায় বললো, 'হ্যাঁ, দেখা ছাড়া উপায়ই কী আছে। তবে স্যার, কাগজ পড়ে দেখলাম, খুনটা সাংঘাতিক নৃশংসভাবে ঘটেছে। মহিলার গলার মধ্যে ফর্ক ঢুকিয়ে খুন করেছে।'

আমার চোখের সামনে, রূপার সেই নিহত মূর্তি ভেসে উঠলো। পার্থ রায়ের এসব কথা আমাকে বলার কোনো অর্থ নেই, সব আমি নিজের চোখেই দেখেছি, এবং এখনো দেখতে পাচ্ছি। ডি ডি-র

কথা মনে পড়তে, এখন আমার আরো অবাক লাগে যে, রূপাকে কেউ জোর করে রেপ্ করে নি। অভিজ্ঞের মতামত হচ্ছে, রূপা নিজের ইচ্ছায় সেকস্ এনজয় করেছে। তার মানে—চাকরের উক্তি আমার মনে পড়ে গেল, আমাকে সে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় ফ্রিজ খুলতে দেখেছিল, যে-কথা আমি মোটেই মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমার সেই নগ্ন মূর্তিকে আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এবং রূপার স্বইচ্ছায় সেকস্ এনজয় করাটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যদিচ সে কথাও আমি মনে করতে পারি না। কেন? সত্যি কি পারি না? (রূপার নগ্ন শরীর আমার চোখের সামনে ভাসছে। কেবল নগ্ন শরীর না, ওর যৌবন টলটল শরীরের নানান ভঙ্গি। উদ্বেল শৃঙ্গার, আবেগ মথিত রক্তিম দৃষ্টি, ঠোঁটের অভিব্যক্তিতে, যা কেবল হাসি না, একট উচ্ছ্রিত মিলনের কামনা, বাসনা দগ্ধ শীৎকার, এবং আলিঙ্গন এবং আগ্রাসী চুম্বন) এবং তারপরে অন্ধকার—অন্ধকার গভীর, গভীরতর—কিন্তু হঠাৎ একটা কথা যেন চাবুকের শিসের মতো আমার কানে বেজে উঠলো, 'বড় অ-সুখ, বড় অ-সুখ, এই পাওয়া···যা-ই ঘটুক, ভয় পাই না, চিরদিন চাই।'···গলার স্বর আমার। কথা ক'টি চাবুকের ঝাপটার মতো বাজতে লাগলো, এবং তার মধ্যেই, পার্থ রায়ের গলা আমি শুনতে পাচ্ছি, তার মুখ আমার সামনে, 'আশ্চর্য, খুনী কোনো চিহ্নই রেখে যায় নি, অথচ ভীষণ রক্তপাত হয়েছে, বেড শীট দিয়ে রক্তের ফিনকি চেপে ধরা হয়েছিল।'···আমার শিরদাঁড়ার নিচের কেন্দ্রে বিদ্যুৎ হানলো, আমি তাড়াতাড়ি ডেকে উঠলাম, 'মিঃ রায়!'

পার্থ রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'কী বলছেন? আপনার ভয় করছে?' বলতে বলতে সে আমার কাছাকাছি চলে এলো। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হলো, চেতনা সচকিত। বললাম, 'ভয়? না, ভয় না—মানে, রূপা চৌধুরী আমার বন্ধু ছিল, ওর খুনের কথা শুনলে আমি যেন নিজেকে স্থির রাখতে পারি না।'

পার্থ রায় অবাক স্বরে বলে উঠলো, 'ওহ্, ঠিক আছে, ওসব নিয়ে আর ডিসকাশন করবো না।'

বলতে বলতে পার্থ রায় উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি এখন খাবেন? খাবার পাঠাতে বলবো?'

বললাম, 'না, এখন আর খাবার ইচ্ছা নেই।'

হাতের কব্জির ঘড়ি দেখলাম, তিনটা বাজে। পার্থ রায় বেরিয়ে গেল, কিন্তু যাবার আগে, তার চোখে মুখে কেমন একটা অবাক জিজ্ঞাসা দেখলাম। আমিও উঠে দাঁড়ালাম, আর একবার আয়নার সামনে গেলাম। আমার মুখে কি ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল? এখন অবিশ্যি আমার মুখের অবস্থা আর বর্ণ অনেক স্বাভাবিক। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে, অফিসের অন্যান্য বিভাগে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, একজন বেয়ারা ঢুকলো, কিছু ফাইলপত্র নিয়ে। তার পিছনেই ক্যাশিয়ার অবনীবাবু। একলা চুপচাপ বসে না থাকার জন্যই বাইরে যাচ্ছিলাম। ডাকলাম, 'আসুন অবনীবাবু, বসুন।'

আমি বসলাম।

৫

বিকাল পাঁচটায় অফিস থেকে বেরিয়ে, ডক্টর ব্যানার্জির চেম্বারে গেলাম। মনে করেছিলাম, উনি আসেন নি, অপেক্ষা করতে হবে। সাড়ে ছটার আগে চেম্বারে আসেন না। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, এসে পড়েছেন। বললেন, 'একটু আগেই এসেছি। আপনার জন্য। ঘণ্টা খানেক আগেই এলাম। ভাবলাম, কী জানি, কী অসুখ করেছে আপনার।'

হেসে বললেন, 'বসুন। এখানে আর কেউ আসবে না। আপনি নিশ্চিন্তে সব কথা বলতে পারেন। ঘণ্টা খানেক সময় পেলে আপনার হবে তো?'

আমি একটু লজ্জিত হেসে বললাম, 'যথেষ্ট।'

আমি জানি, ডক্টর ব্যানার্জির মতো একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের এক ঘণ্টার মূল্য কতোখানি। তিনি আমার থেকে কিছু বড়, রাশভারি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, যদিচ সদালাপী, নিরহংকারী। তিনি জেনারেল ফিজিশিয়ান নন, মেডিসিন তাঁর বিষয়বস্তু, তথাপি আমাদের পরিবারের সঙ্গে অনেককাল পরিচয়। প্রথম পাস করে, হাউস সার্জন থাকাকালীন, বাবার সঙ্গে পরিচয়, তারপরে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। নিজের বিষয়বস্তু ছাড়াও, তাঁর অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানের বিস্তৃতি অনেকখানি। আমাদের পরিবারে, কারোর কোনো অসুখ

হলে, আগে তাঁকেই জানানো হয়। তারপরে তিনি যা উপদেশ দেন, তাই করা হয়। বিশেষ করে, আমার বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। আমার যে মাঝে মধ্যে ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়, এ বিষয়ে তিনি জানেন এবং অনেক কথাও বলেছেন। আমাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছেন।

আমি বসবার পরে, তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঙুলের ব্যথাটা কেমন আছে?'

বললাম, 'অনেক কম। একজনকে দেখিয়েছিলাম। ফ্রাকচার না, একটা মালিশের ওষুধ লাগিয়েছি।'

ডঃ ব্যানার্জি বললেন, 'টেলিফোনে শুনে, আমারো তাই মনে হয়েছিল। তারপরে বলুন, আপনার কী স্নায়ুর অসুখের কথা বলছিলেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, গতকাল থেকে আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। তার আগে, আপনাকে আরো কিছু বলা দরকার।'

আমি সমস্ত ঘটনা ওঁকে বললাম। আমার কথা শুনতে শুনতে, ওঁর মুখে নানান অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। আমার বক্তব্য যতোই শেষ হয়ে এলো, ওঁর চোখে মুখে যেন একটা ভ্রূকুটি তিরস্কার, বিরক্তি, এমন কি ক্রোধের সঞ্চার দেখতে পেলাম। যে কারণে, আমার কথা বলতে অস্বস্তি হলো। উনি আমার চোখে, ওঁর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ করে বললেন, 'বলুন, বলে যান, থামবেন না।'

আমি আজ দুপুরের, লাঞ্চের ঘটনা পর্যন্ত সব ব্যক্ত করে বললাম, 'তারপরে আর নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারলাম না, আপনাকে টেলিফোন করলাম।'

ডক্টর ব্যানার্জি তখনই কিছু বললেন না, একভাবে, তীক্ষ্ণ চোখে, আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি এখন অস্বস্তি বোধ করলাম, ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে

পারলাম না। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। উনি বললেন, 'হুঁম্, কিন্তু দুর্ঘটনা যা ঘটবার, তা ঘটে গেছে।'

আমি উদ্বিগ্ন চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ দুর্ঘটনা ?'

উনি বললেন, 'সব দুর্ঘটনা। রূপা চৌধুরীর খুন, আর আপনার অসুখ। আপনাকে আমি অনেকদিন আগেই সাবধান করেছিলাম, একটা পারটিকুলার কোয়ান্টিটির পরে, আপনি আর ড্রিংক করবেন না। সে কথা আপনি শোনেন নি।'

ডক্টর ব্যানার্জিকে এখন আর বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে না, কিন্তু তাঁর মুখ থম্‌থম্ করছে।

আমার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ এতো সত্যি, আমার জবাব দেবার কিছু নেই, তা-ই বিমর্ষ সঙ্কোচে একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রূপার মার্ডারও কি আমার ব্ল্যাকআউটের জন্য ?'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'টু সাম এক্সটেণ্ট, নিশ্চয়ই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার ব্ল্যাক আউট পিরিয়ডের মধ্যেই, যা কিছু ঘটবার ঘটে গেছে। পরশু রাত্রে আপনার ব্ল্যাকআউটের পিরিয়ড অনেকখানি সময়। আপনি নেকেড অবস্থায়, ফ্রিজ খুলে, সোডার বোতল বের করার আগে থেকেই, আপনার ব্ল্যাকআউট পিরিয়ড শুরু হয়েছিল। তারপরে আপনি রীতিমতো স্যুটেড বুটেড হয়ে, গাড়ি চালিয়ে, আপনার বন্ধুর বাড়ি গেছেন, রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন রোল্ কিনেছেন, বাড়ি ফিরেছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেও আপনি মনে করতে পারেন নি, আপনার আঙুলে কেমন করে লেগেছে। আপনার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত একটা লঙ্ পিরিয়ড কেটেছে, এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে এবং ঘটেছে। আপনার যদি ব্ল্যাক-আউট না হতো, হয় তো এ দুর্ঘটনা এড়ানো যেতো।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে ?'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'দো আয়াম নট অ্যান ইনভেস্টিগেটর অব্ মার্ডার। তবু এটা তো সহজেই বলা যায়, আপনি যদি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে চলে না আসতেন, তা হলে খুনী ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকতে পারতো না। অবিশ্যি, সত্যি যদি খুনী বাইরে থেকে এসে থাকে। চাকরটার মার্ডারের কোনো মোটিভ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। মিসেস চৌধুরির টাকা পয়সা গহনা চুরি গেলে, সেটা বলা যেতো। তা ছাড়া, চাকরই ব্যাপারটা সবাইকে জানায়, সে পালিয়ে যায় নি। এ কথা বলতে পারি না। সে একজন সেডিস্ট। সেডিজমের সঠিক আচার আচরণ বলাও মুশকিল। যদি বলা যায়, পীড়ন ধর্ষণ তারপরে খুন করা তাদের কাজ, তা হলেও একটা বিষয় পরিষ্কার, রূপা চৌধুরিকে কেউ ধর্ষণ করে নি। এটাও বোধহয় খুনীরই একটা ট্যাকটিস্, রেপ করা হয়েছিল, এটা বোঝানো। আদৌ যা হয় নি।'

'তা হলে, এ খুনের কী মোটিভ হতে পারে, আপনার মনে হয়?'

'অনেক কিছু। প্রতিশোধের জন্য খুন করতে পারে, তা যে কোনো কারণেই হোক। কে বলতে পারে, আপনার বান্ধবী কারোকে ব্ল্যাকমেলিং করছিলেন কী না? আর একটা ভাইটাল কারণ থাকতে পারে। ঈর্ষা। জেলাসি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জেলাসি?'

ডক্টর, ব্যানার্জি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, জেলাসি। আমি প্রেমজাত ঈর্ষার কথা বলছি। কথাটা পুরনো শোনালেও, সত্যি, ভালবাসা আর প্রতিহিংসাপরায়ণ ঘৃণা, এ পিঠ ও পিঠের ব্যাপার। একটা থেকে আর একটা জ্বলে উঠতে পারে।'

বললাম, 'আমি এরকম কথা শুনেছি, ব্যাপারটা বুঝি না।'

ডক্টর ব্যানার্জি একটু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা ওথেলোও বুঝতো না। কিন্তু সে ভেসডেমোনিয়াকে হত্যা করেছিল। এটাকে অনেকে

মনোগ্যামির রক্ষণশীলতার পর্যায়ে ফেলতে পারে, আদৌ তা না। প্রেমে ব্যর্থতা আর না পাওয়ার যন্ত্রণা আর হিংসা, আলাদা। আমার নিজের চোখে দেখা, দু একটা ছোট ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। একটি পাঁচ ছ' বছরের ছেলে তার বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। তার মা তাকে বকলে বা দু চার ঘা মারলেও সে সহ্য করে, কিন্তু তার বাবা সামান্য গায়ে হাত তুললেও, সে এমনই ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই সে চিৎকার করে, তার বাবার মৃত্যুকামনা করে, খারাপ ভাষায় গালাগাল দেয়। একটি ওয়ার্স্ট ঘটনা জানি। পাঁচ বছরের ছেলে, তার বাবার হাতে একটি চাটি খেয়ে, চারতলার ব্যালকনি থেকে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গেছলো। কারণ, ছেলেটির অসহায় রাগ এবং ঘৃণা। পারলে সে তার বাবাকেই চারতলা থেকে ফেলে মেরে ফেলতো। সেটা সম্ভব ছিল না। এটাকে মোটেই পজেসিভ্‌নেস্ বলে না। লাভ এ্যাণ্ড হেট্রেডের ব্যাপার।'

আমি যেন মনে মনে শিউরে উঠলাম, পরমুহূর্তেই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলাম। আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো, যেন অন্ধকারের মধ্যে, একটা বন্ধ দরজার গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলছেন, রূপা এই কারণে খুন হয়েছে?'

ডক্টর ব্যানার্জি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, রূপা চৌধুরী এই কারণেও খুন হতে পারেন, যদি তাঁর জীবনে সেরকম কোনো পুরুষ থেকে থাকেন। কে বলতে পারে, তাঁর প্রাক্তন স্বামীই এ কাজ করতে পারেন।'

আমি বললাম, 'তা কী করে সম্ভব? রূপার একস্ হাজব্যাণ্ড আবার বিয়ে করেছে। যতোদূর জানি, সে এখন বেশ সুখী।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। জেলাসি মাটির নিচে সাপের মতো, ওপর থেকে বোঝা যায় না, অনেককাল ধরে থাকতে পারে। অবিশ্যি পুলিস নিশ্চয়ই এ বিষয়ে খোঁজ খবর করে দেখবে। মিঃ

চৌধুরি পরশু রাত্রে কোথায় কখন ছিলেন, তাঁর এ্যালিবাই পরীক্ষা করে দেখবে। আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছি মাত্র।'

'সে কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরে থাকে।'

ডক্টর ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'হাজার মাইল দু'ঘণ্টায় আসা যায়। খোঁজ খবর রেখে, কেউ কিছু করতে চাইলে, দূরত্বটা তার কাছে কোনো ক্রাইসিস না।'

যুক্তিপূর্ণ কথা, আমার প্রতিবাদের কিছু নেই। যদিচ নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

ডক্টর ব্যানার্জি আবার বললেন, 'এবার আপনার কথা বলুন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমার শরীরের—।'

'আপনার শরীরের কথায় পরে আসছি।' ডক্টর ব্যানার্জি বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি রূপা চৌধুরিকে কী চোখে দেখতেন?'

'প্রীতির।'

'না, তার থেকে কিছু বেশি। শুধু প্রীতির সম্পর্ক আলাদা। আপনাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে, আপনারা কোনো বাধাই মানেন নি, রাখেন নি। বন্ধুত্বের পর্যায়ক্রম মানতে গেলে, একটি মহিলা বন্ধুর সঙ্গে, আপনার দৈহিক পর্যায়ের সমস্ত সীমাই অতিক্রম করে গেছে, তাই না?'

আমাকে স্বীকার করতে হলো, 'হ্যাঁ।'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'এ ক্ষেত্রে আপনারা দুজনেই ফ্রি লান্সার। আপনাদের মধ্যে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই, আপনারা কেউ তা এ্যাডাপ্ট করতেও চান নি, না?'

ডক্টর ব্যানার্জির দৃষ্টি আমার চোখে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু আপনি রূপা চৌধুরীর কলকাতায় আসার সময়ের কথা মোটামুটি জানতেন, টেলিফোনের জন্য সে সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন, নিজের কাজের বিষয়েও আনমাইণ্ডফুল হয়ে যেতেন। বছরে, দু এক

দিনের জন্য হলেও, আপনি রূপা চৌধুরীর কাছে বম্বেতেও যেতেন। তার মানে, বছরে প্রায় বার চারেক আপনাদের দেখা সাক্ষাত হতো।'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা দুজনেই দুজনকে দেখবার বা পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে থাকতেন।'

'রূপার কথা বলতে পারি না, আমি তো যেন তাই থাকতাম।'

ডক্টর ব্যানার্জি একটু হেসে বললেন, 'প্রেম ভালবাসার কথা আপনি বোঝেন না বলেন, ওটা আর বলবো না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি, শুধু ফিজিক্যালি না, মেণ্টালিও আপনি রূপা চৌধুরীর সম্পর্কে ইনভবলবড্ ছিলেন?'

মুহূর্তের মধ্যেই মনে হলো, রূপার মুখ আমার বুকে গোঁজা। একটা কষ্ট বোধের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ, তা বলা যায়।'

'তবু আপনার অভিমত হলো, রূপা চৌধুরী স্বেচ্ছাচারিণী। নিজের সম্পর্কে তার নিজের ইচ্ছাই সব।'

আমার কি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে? আমার যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বললাম, 'সেটাও সত্যি।'

ডক্টর ব্যানার্জি কয়েক সেকেণ্ড আমার চোখে চোখ রেখে, ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার ব্ল্যাকআউটের বিষয়ে, আপনাকে আগেই বলেছি। এই যে স্মৃতির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, একেবারে টোটালি ভুলে যাওয়া, এটা স্ব-ইচ্ছায় ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই উদ্ভুত। এটা একটা ব্যাধি। অসুস্থ ব্যক্তির সাবকন্সাস মাইণ্ডেই তা থাকে, সে নিজেও জানে না, যা সে মনে করতে পারে না, তা সে মনে রাখতে চায় না বলেই, ভুলে যায়।'

আমার মধ্যে সেই অদ্ভুত অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠলো, আমি যেন অন্ধকারে বন্ধ দরজায় আঁচড়াতে আরম্ভ করেছি, তথাপি ডক্টর ব্যানার্জির কথা শুনে, আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এ প্রসঙ্গে কেন

তিনি এলেন, এবং আমি তাঁর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছি না। তিনি আবার বললেন, 'আপনি যদি আপনার অবচেতন অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে দেখতে পেতেন, ব্ল্যাকআউট পিরিয়ডে আপনি কী করে-ছিলেন, তাহলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেতো। মনে করতে পারেন, আপনি তখন ফর্ক হাতে নিয়েছিলেন কী না?'

ফর্ক! একটা ঝকঝকে তীক্ষ্ণ ফর্ক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, যা একটা উদ্যত কংকালের থাবার থেকেও, কংকালের দাঁতের মতো মনে হলো। ঝটিতি আমার শিরদাড়ার নিচের কেন্দ্রে বিদ্যুৎ হানলো, এবং আমি যেন অন্ধকারে সেই বন্ধ দরজাটা দু হাতে আঁকড়ে ধরবার জন্য হাত তুললাম, আর শিরদাড়ার কাঁপুনি ক্রমে মস্তিষ্কের দিকে কিলবিল করে অগ্রসর হতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শব্দ এবং চিৎকারে, আমি স্থির হয়ে গেলাম। সেই অবস্থায় ডক্টর ব্যানার্জি দু হাতে আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'আপনার আবার সেই অবস্থা হচ্ছিল, না?'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। তিনি বললেন, 'বুঝেছি। কিন্তু সেই অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়তে পারলেন না, তাই না?'

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম। ডক্টর ব্যানার্জি দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু হয় নি, তুমি যাও। পেশেন্টদের বসাও, সময় হলে বলবো।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ডক্টর ব্যানার্জির অফিস বেয়ারা অবাক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্দেশ পেয়ে, দরজা বন্ধ করে চলে গেল। বোধহয় শব্দে আর চিৎকারেই সে এ ঘরে এসে ঢুকেছিল। শব্দটা ডক্টর ব্যানার্জিই করেছিলেন, টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে। চিৎকারও তিনি করেছিলেন। বললেন, 'বসুন মিঃ মিত্র।'

আমি বসলাম। তিনি কাগজ কলম টেনে নিতে নিতে বললেন,

'আই ক্যাননট ইনভেস্টিগেট এ মার্ডার, বাট আই ক্যান ইনভেস্টিগেট এ ডিজিজ। বাড়িতে অফিসে বা রেস্তোরায়, যেখানেই যান, সব জায়গায় আগেই জানিয়ে দেবেন, আপনার সামনে যেন কখনো ফর্ক না আনা হয়।'

'কেন?'

'ফর্ক আপনার ব্রেইনের ইকিয়ুলিব্রিয়াম নষ্ট করছে। শুধু চোখে দেখা না, এমনকি নাম শুনলেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে, আপনাকে কনভালশনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কনভালশন?'

'হ্যাঁ, একে বলে সন্ন্যাসরোগের লক্ষণ, আই মীন্, এপিলেপ্‌সি।'

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠলো, 'এপিলেপ্‌সি?'

ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, 'ভয় নেই, একেবারে গোড়াতেই ধরা পড়েছে, দিস ইজ এ ক্যুরেবল ডিজিজ ইন দিজ ডেজ। সেরে যাবে!'

আমি অসহায়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু আমার কেন এ অসুখ করলো ডক্টর ব্যানার্জি?'

ডক্টর ব্যানার্জি আমার দিকে কৃপা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'সম্ভবতঃ আপনার পরশু রাত্রের ব্ল্যাকআউটের সঙ্গে, এই রোগের সূত্রপাতের কোনো যোগাযোগ আছে, যা কোনদিনই জানা যাবে না। এটা একটা রিয়্যাকশন।'

আমি হতাশ বিমর্ষ হতবাক চোখে ডক্টর ব্যানার্জির দিকে তাকালাম। ডক্টর ব্যানার্জি মুখ নিচু করে লিখতে লিখতে বললেন, 'আমি একটা ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি, এটা আজই খাওয়া শুরু করুন।'

ওষুধের নাম লিখে, কাগজটা তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ড্রিংকটাকে একটা লিমিটের মধ্যে আনুন। কী করবেন বলুন, সকলের কনস্টিটিউশন এক রকম না। আপনার লিমিটলেস্

হলেই আপনার ব্ল্যাকআউট হয়। আর একজনের হয় না। সেজন্য আপনাকেই সাবধান হতে হবে।'

ডক্টর ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পার্স বের করলাম। ডক্টর ব্যানার্জি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'ওটা পরে চেয়ে নেব, এখন আপনি বাড়ি যান। মনে রাখবেন, ব্ল্যাক আউট যদি ক্রাইম হয়, এ অসুখ আপনার পানিশমেন্ট।'

আমি ডক্টর ব্যানার্জির মুখে দিকে একবার দেখলাম। তিনি সহৃদয় ভাবে হাসছেন। আমি ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম। জনবহুল পথে, গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হলো, এই চলমান জগৎ সংসার থেকে, আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। সকলের মাঝখানে থেকেও, আমি নরকবাসী, শাস্তি ভোগ করছি। কিন্তু কেন, তা জানি না, কারণ অন্ধকার গভীর, তার পর্দা কখনো ছিন্ন করা যাবে না।